



জমাদিউল সানী-রজব-১৪৩৬
চৈত্র-বৈশাখ-১৪২১
এপ্রিল-মে -২০১৫

উপদেষ্টা

ডঃ মুহাম্মদ আকবর আলী প্রধান
ডাঃ শাখাওয়াত হাসান চৌধুরী

পৃষ্ঠপোষক

হাজী মোঃ নাসিমুজ্জামান
গাজী মোঃ সোহানুর রহমান

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক

হাসিনা বেগম

সহ-সম্পাদক

খাদিজা বেগম

গবেষণা বিধায়ক

ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জামান
ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান

সহকারী সম্পাদক

ডাঃ তারেকুজ্জামান

বিভাগীয় সম্পাদক

জোহরা বেগম

সার্কলেশন ম্যানেজার

ইঞ্জিনিয়ার কবিরুজ্জামান

অফিস তত্ত্বাবধায়ক

হাশেম আলী
আছিয়া বেগম

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক

জনাব, মোঃ রাহাতুজ্জামান খান

কম্পিউটার ইনচার্জ

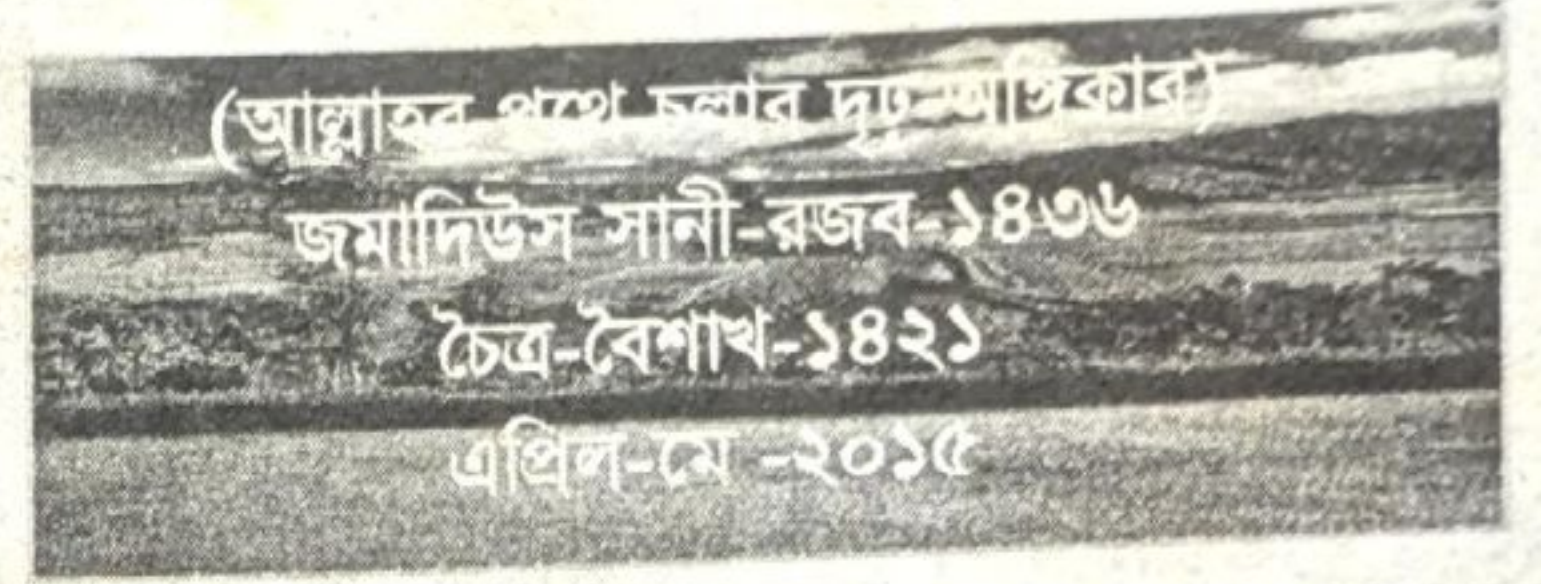
দবিরুদ্দীন আলম

বিনিময়ঃ বিশ টাকা মাত্র।

জান্নাত প্রকাশনী-ঢাকা

৩২/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



ভিতরের ফলগুধারা

⇒ দারসুল কুরআন	২
⇒ দারসুল হাদীস	৪
⇒ সম্পাদকীয়	৫
⇒ সত্য চির অম্লান	৬
⇒ কেন এই সাময়িকী?	৭
⇒ সাময়িক প্রসংগ	৮
বিশ্ব তাগুতের বিরুদ্ধে : রুখে দাঁড়াও মুসলিম	১০
⇒ যে আদর্শ চির অনুসরণীয়	১১
⇒ প্যারিস অভিযান	১২
⇒ ফিসাবিল্লাহর বিশ্লেষণ	১৩
⇒ আল্লাহর পথ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়	১৪
⇒ বাতিল রাজনীতি	১৭
⇒ বাতিলের প্রতিপত্তি ও আমাদের করণীয়	১৮
⇒ আসুন সাবধান হই	২০
⇒ পাঠকের জিজ্ঞাসা ও জবাব	২০
প্রশ্ন ১ঃ আল্লাহর পথ বিমুখ কারা?	
প্রশ্ন ২ঃ আদেশ নিষেধ ত্যাগের পরিণাম?	
⇒ দায়িত্ববোধের স্মরণ	২৬
⇒ ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস	
ইমানদীপ্ত দাস্তান	২৮
⇒ তায়কিয়াতুন নুফুস	২৭
⇒ কবিতার আসর	২৮
⇒ দুর্ধর্ষ গেরিলা মুজাহিদ	৩০
⇒ মুসলিমাদের পাতা	৩১
সং নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ	
সং স্ত্রীর গুণাবলী	
স্বামীর খেদমত জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যম	
জান্নাতের অঙ্গীকার	
জান্নাতী স্ত্রীর কতিপয় আলামত	
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার	
⇒ সংবাদ পরিক্রমা	৩৬
⇒ আবিষ্কারের কাহিনী	
সাবমেরিন	

ধারাবাহিক তাফসীরমূলক উপস্থাপনা

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ

أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ

“এই কিতাব (আল-কুরআন) আমি নাযিল করেছি, যা অত্যন্ত বরকতময়, যেন মানুষ এর আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করে এবং উলুল আলবাবগণ উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা সোয়াদ : ২৯)।

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“তারা কি কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করবে না? না-কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?” (সূরা মুহাম্মাদ : ২৪)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ

غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না কেন? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচনা হতো তবে এতে বহু অসংগতি পেত।” (সূরা নিসা : ৮২)।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম) অর্থঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এটা পবিত্র কুরআনের আয়াত নয়। তবে আল্লাহ সুবহানাছ তা'য়ালার নির্দেশ হল, “যখন তুমি কুরআন পাঠ করতে যাবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিবে।” (সূরা আন-নাহল : ৯৮)।

সুতরাং উক্ত আয়াতের নির্দেশ পালনে-ই আমরা “আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম” পাঠ করে থাকি। পবিত্র কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার উপর নবী (সঃ) ও সাহাবাগণের (রাঃ) আমল ও ইমামগণের ঐক্যমতের বিষয়টিও আয়িম্মা আল মুফাসসিরীগণের বর্ণনায় উঠে এসেছে। যদিও কোন কোন ইমাম এটা ওয়াজিব কি-না এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বা আলোচনা করেছেন, কিন্তু এ প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং এর উপর আমল করলে অকল্যাণের কোনই সম্ভাবনা নেই।

না করলে অনিষ্ট এমনকি গুনাহের

সম্ভাবনা থেকেই যায়। সুতরাং এটা পাঠ ওয়াজিব না মুস্তাহাব এই প্রশ্ন সামনে আনার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা পাঠ করব; ইনশা আল্লাহ।

শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য পঠিত এই ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম’ ছাড়াও ভিন্ন আরো কিছু পাঠ হাদীস ও ইমামগণের আলোচনায় অনুমোদিত। তন্মধ্যে-

১. আউযুবিল্লাহিস সামিয়িল আলিমি মিনাশ শায়তানীর রাজীম।

২. আসতায়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানীর রাজীম।

৩. আসতায়ু বিল্লাহিস সামিয়িল আলিমি মিনাশ শায়তানীর রাজীম।

৪. আউযুবিল্লাহিস সামিয়িল আলিমি মিনাশ শায়তানীর রাজীমি মিন হামাযিহি ওয়া নাফাযিহি ওয়া নাফাযিহি। (তিরমীযি, আবু দাউদ)।

কোন কোন বর্ণনায় মীম, ফা এর উপর সাকিন দিয়ে হামযিহি, নাফযিহি, নাফযিহি রয়েছে। অর্থগত কোন সমস্যা নেই। উভয়ই সঠিক। এসবগুলোর উদ্দেশ্য একটিই, তা হলো আল্লাহর নিকট শয়তান হতে আশ্রয় গ্রহণ। সুতরাং উপরোক্ত ৫টি পাঠের যে কোন একটি পাঠ করলেই আল্লাহর নির্দেশ পালন হবে বলে আশা করি। তবে এর কোনটিতে আউযু বা আসতায়ীযু বিল্লাহি শব্দের পর আল্লাহর পবিত্র ২টি নামের ব্যবহার বেশী হয়েছে বিধায় এতে বরকত প্রাপ্তির আশাও বেশী করা যাবে। কারণ, বিভিন্ন হাদীসে দু'আর মধ্যে আল্লাহর পবিত্র নাম সমূহের উল্লেখ করার তাগিদ ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর আউযুবিল্লাহ হল একটি দু'আ। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই। কুরআন তেলাওয়াতের বেলায় শয়তান হতে আশ্রয় নেয়া সংক্রান্ত আহকামের মূল আলোচনা এ পর্যন্তই। বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য আগ্রহী কেউ ইমাম ইবনু কাসীর রচিত তাফসীর গ্রন্থের (মূল আরবী) প্রথম খন্ডের সূচনা পর্ব, ইমাম ইবনু জারীরের তাফসীর তাবারী ১ম খন্ডের সূচনা পর্ব ইত্যাদি পাঠ করতে পারেন।

আমরা এখন আউযুবিল্লাহ পাঠের বা শয়তান হতে আশ্রয় নেয়ার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করব। সূরা আল-আরাফ ২০০ এবং সূরা হা-মীম-সাজদাহ ৩৬ আয়াত দু'টি ছবুছ একই, যেখানে বলা হচ্ছে, “আর যখন শয়তানের কুমন্ত্রণা

তোমার নিকট এসে যায় তখন আল্লাহর আশ্রয় নাও, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” সুতরাং শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর আশ্রয় নেয়ার জন্য উপরোক্ত পাঁচটি পাঠের যে কোনটি অথবা সূরা আল-আরাফ ২০০ এবং সূরা হা-মীম-সাজদাহ ৩৬ আয়াত দু’টির সংগতি রেখে ‘আউযু বিল্লাহ বা আসতাইয়ীযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানীর রাজীম’ এর শেষে আয়াতের শেষাংশের উদ্ধৃতি “ইন্নাল্লাহা ছয়াস সামিয়ুল আলীম” পাঠের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। তবে এই ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনেই সূরা আল-মুমিনুন ৯৭-৯৮ আয়াতদ্বয় মিলিয়ে অন্য একটি পাঠ এসেছে। তা হল- “রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শাইত্বান ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আয়্যাহযারুন।” এক্ষেত্রে এ পাঠটিও নিঃসন্দেহেই উত্তম।

সুতরাং যে কোন সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা আমাদের নিকটবর্তী হলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করা আমাদের দায়িত্ব। অতএব, আমরা আল্লাহর নিকট তাওফীক্ কামনা করছি। বিভিন্ন বর্ণনায় এর উপর নবী (সঃ)এর আমল ও নির্দেশনার কথা পাওয়া যায়। ক্রোধের বা রাগের সময় শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনারও বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। আর রাগে তো শয়তানের-ই উস্কানি থাকে।

কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততি, বংশধারা, স্ত্রী, শিশু এদের জন্য শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয়ে প্রার্থনার বিষয়টি উঠে এসেছে। সাধারণ অর্থে তো যে কেউ তার অন্য বন্ধু-শুভাকাংখী বা মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য দু’আ স্বরূপ এমন আশ্রয় প্রার্থনা করতেই পারবেন, কিন্তু নবজাতক, অবুঝ শিশু ও স্ত্রীর বেলায় এমন প্রার্থনার একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর মা তার নবজাতক কন্যা মারইয়াম ও মারইয়ামের পরবর্তী বংশ ধারাকে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পন করে প্রার্থনার উল্লেখ এসেছে (সূরা আল-ইমরান : ৩৬) নং আয়াতে।

একইভাবে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে সূরা ক্বালামের ৫১ নং আয়াতের তাফসীরে। ঐ হাদীসের ভাষ্য হল- “মুসনাদে আবদির রাজ্জাকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নলিখিত কালিমা দ্বারা হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ‘আয়িযুকুমা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বানি ওয়া হাম্মাতি ওয়া মিন কুল্লি আঈনীল লাম্মাতি।’

(এই হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন)।

এছাড়া ঘুম হতে জাগ্রত হবার পর হতে পরবর্তী ঘুম পর্যন্ত তথা দিন-রাত্রির পুরো সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে বাঁচতে, পাঠ করতে সক্ষম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উচিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ ও সূরা নাস এবং ঘুমের পূর্বে এই চারটির সাথে সূরা বাকারাহর শেষ দু’টি আয়াত পাঠে কোন প্রকার অলসতা না করা। এছাড়াও এই সময়গুলোর এবং সকাল-সন্ধ্যার আরও যেসব যিকর রয়েছে তা পাঠে আমাদের সচেতনতা অব্যাহত থাকবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহর নিকট তাওফীক্ চাচ্ছি। এবার আমরা আলোচনা করব শয়তানের কুমন্ত্রণার ধরণ সম্পর্কে। (পরবর্তী সংখ্যায়, ইনশা আল্লাহ) ॥

আল কুরআনুল কারীম

বিশ্বমাঝে সুর উঠেছে একই তানে একই রব
তার বিধানই হচ্ছে গাওয়া সর্বদা তার কলরব।
নিত্য আযান হলে সলাত, কিইবা দিবানিশ
তার বিধানই হচ্ছে গাওয়া হোক না যুবা শিশু।
নিত্য আযান তাওহীদেরই একক ঘোষণা
জাগায় সকল মুমিন হৃদয়ে ঐশী প্রেমণা।
তাই তো তারা হলে আযান ছুটছে মসজিদে
হৃদয় তাদের বাঁধা যেন আছে তাতে বিঁধে।
আছে লক্ষ নিত্য হাজার উঠছে গড়ে নব
নামের খোলস ছাড়িয়ে দেখ পাবে একই রব।
বিশ্বমাঝে সুর উঠেছে একই তানে একই রব
তার বিধানই হচ্ছে গাওয়া সর্বদা তার কলরব
বিশ্ব মাঝে যত সংঘাত জিহাদ কিংবা লড়াই
তার বিধানের তরেই হচ্ছে করছি না বড়াই।
তার বিধানের সমতুল্য ত্রি জাহানে নাই
তার বিধানের সুরের মতো আর না কোথা পাই
তার বিধানেই আছে শান্তি আছে ন্যায় বিচার
তার বিধানের গুণের কথা বলব কি ভাই আর?
ইহ-পার লৌকিক জীবন হবে তাতে পাস
তার বিধান মিসকারীরা করবে হা-ছ-তাস।
তার বিধান পালনকারী হবে সম্মানিত
তার বিধান মিসকারীরা হবে কলংকিত।
তার বিধান পালনকারী স্বর্গে করবে বাস
তার বিধান মিসকারীরা হবে জাহান্নামের খাস।
এসব কথা নতুন নয়তো যেন উঠছে কলরব
বিশ্বমাঝে সুর উঠেছে একই তানে একই রব।

দারসুল হাদীস

দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কিতালঃ
দ্বীনের (ইসলামের) ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা একটি
মারাত্মক অপরাধ। এর শাস্তিসম্পর্কে আল্লাহর রসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন-
নোটঃ শাসকদের কুফরী কাজের মধ্যে একটি হলো
আল্লাহ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন সেবিধান অনুযায়ী
শাসন না করা। আল্লাহ তা'আলা এদের উদ্দেশ্যে বলেন-
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
আর যেসব লোক আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন,
সে অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে না তারাই কাফের।
(সূরা মায়িদাহ ৫:৪৪)

আরফাজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই নানা প্রকার ফিতনা-
ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাবে, তরবারী দিয়ে তার গর্দান
উড়িয়ে দেবে। চাই সে যে কেউ হোক না কেন। ১০
(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)

এ ব্যাপারে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

أَتَاكُمْ مَنْ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ
يُرِيدُ وَاحِدَ رَجُلٍ عَلَى جَمِيعٍ وَأَمْرُكُمْ
فَأَقْتُلُوهُ جَمَاعَتَكُمْ يَفْرُقُ أَوْ عَصَاكُمْ يَشُقُّ أَنْ
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
তোমাদের এক নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ থাকার অবস্থায় যে
ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা
তোমাদের এক বিনষ্ট করতে চায়, তাকে তোমরা হত্যা
করবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)

মুজাহিদদের দুনিয়া ও আখিরাতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা
নিজে নিয়ে নেনঃ

إِلَّا بَيْتِهِ مَنْ يُخْرِجُهُ لَأَسْبِيْلِهِ فِي جَاهِدٍ لِمَنْ اللَّهُ تَكْفَلُ
يُرْدُّهُ أَوْ الْجَنَّةُ يُدْخِلُهُ أَنْ كَلِمَتِهِ وَتَصْدِيقُ سَبِيلِهِ فِي الْجِهَادِ
غَنِيْمَةٍ أَوْ أَجْرٍ مِنْ نَالٍ بِمَا مَسْكَنِهِ إِلَى

আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন, যে তাঁর
রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়, তাকে ঘর থেকে বের করে
কেবল তারই রাস্তায় জিহাদ আর তারই কালিমায় বিশ্বাস।
নোটঃ জমীনে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা আছে, তা উৎখাত না
হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও প্রতিটি
মুসলমানকে কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) চালিয়ে যেতে নির্দেশ
করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
তোমরা কিতাল চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত ফিতনা-ফাসাদ
নির্মূল না হয় আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা
আনফাল ৮:৩৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

বস্তৃত ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার
চেয়েও কঠিন অপরাধ।

(সূরা বাকারাহ ২:১৯১)

আমি হয় তাদেরকে জিহাদের সওয়াব এবং গণিমতের
মাল দিয়ে পরিবার পরিজনের দিকে ফিরিয়ে আনবো,
কিংবা (শাহাদাত দিয়ে) জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

(সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

মন্তব্যঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য যে মুজাহিদ
বের হলো তার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজে নিয়ে নেন।
হয় তাকে গণিমতের মাল (যা দুনিয়ায় সর্বোৎকৃষ্ট হালাল
মাল) দিয়ে গাজী অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন অথবা তাকে
শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ বুখারীর অপর এক
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

الْجَنَّةُ يُدْخِلُهُ أَنْ يَتَوَقَّاهُ بِأَنْ سَبِيلِهِ فِي الْمُجَاهِدِ اللَّهُ تَوَكَّلْ
আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদদের জানড়বাতে প্রবেশের
দায়িত্ব নিয়েছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করেছে।
১১ (সহীহ বুখারী)

দারসুল হাদীসের এই আলোচনায় আমাদের কে পরিষ্কার
নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনাবাজ
দের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক
হলেও সত্য অনেক মুসলিম এমন রয়েছেন যারা কোন
ব্যক্তির প্রতি ভালবাসাকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে বেশি
গুরুত্ব দেয়। যেমন ফেতনাবাজ জানা সত্ত্বেও তার সাথে
অন্তরঙ্গ আচরণ করা। এক্ষেত্রে বলা যায় -

সত্য জানার পর কেবল পূর্বসূত্রীতার বন্ধু বান্ধব বা
আত্মীয়সজনের প্রতি ভালবাসা যদি আল্লাহর বিধান
জানার পরেও প্রাধান্য পায় তবে তাদের ঈমান এখনও
সন্দেহের মধ্যে গণ্য হবে। (যেমন- আমার আগের কোন
প্রিয়পাত্রকে ফিতনা বাজ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্মান,
খেদমত বা কোন সাহায্য সহযোগীতা করলাম, অথচ
আল্লাহর বিধান অন্য। তাহলে আমার ঈমান এখন সংশয়ের
মধ্যেই থাকল। আল্লাহ আমাদের ফিতনাবাজদের ব্যাপারে
তাঁর বিধান বাস্তবায়নকারী হিসেবে কবুল করুন। আমিন

সম্পাদকীয়

আনুগত্যকারী বনাম অজুহাত পেশকারীঃ ফলাফল কী?

আনুগত্যের ব্যাখ্যা আমরা সবাই জানি। তাই এই ব্যাপারে কলেবর বৃদ্ধির জন্য শাব্দিক আভিধানিক প্রভৃতি আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহ তওফিক দান করুন। আমীন

আনুগত্য অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন নিঃশর্ত (কোন বৈষয়িক লেনদেন ছাড়া) আবার শর্ত যুক্ত (কোন বৈষয়িক লেনদেনের মাধ্যমে)। জামায়াতের আনুগত্য হল নিঃশর্ত এবং ফরজ। নিঃশর্ত এই জন্য যে, এখানে বৈষয়িক কোন লেনদেন নেই। তবে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে এই আদেশ ও নিষেধ হতে হবে। নতুবা আনুগত্যের কোন প্রশ্নই আসে না।

হাতও দুই প্রকারঃ হাত, অজুহাত। হাত দিয়ে যেমন আমরা অনেক কার্য সমাধান করতে পারি। হাত ছাড়া আমরা কাজ করতাম কিভাবে? আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের কার্যোপযোগী হাত দিয়েছেন। হাত দিয়ে অনেক ভাল কাজ করা যায়। (অবশ্য খারাপ কাজও করা যায়-আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন আমিন)

কিছু অজুহাত? এটাকে আরও বলা যায় টালবাহানা, গড়িমসি, ফাঁকিবাজি, ধোঁকাবাজি, চালবাজি, অলসতা, ফেরেববাজি, কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, কর্মবিমুখতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি। এই অজুহাত দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় সত্য ক্ষণিকের জন্য। কিছু অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে কি পার পাওয়া যাবে? বলা যাবে কি, পার করে দাও দয়াল আমারে?

সর্বক্ষেত্রে অজুহাত পেশ মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে অনেক কাজ পিছিয়ে পড়ে। সময়ের কাজ সময়ে হয় না। বিশেষ করে ইমারতের ক্ষেত্রে এই অজুহাত পেশ জামায়াতকে শক্তিহীন করার জন্য যথেষ্ট। কেননা আনুগত্যই জামাআতের প্রাণ। আনুগত্য নেই তো আমিরও নেই। আবার আমিরও নেই তো জামায়াতও নেই। আনুগত্যের এই মূলমন্ত্র বোঝার জন্যই তো আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করছেন রসূলের আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য আবার আমীরের আনুগত্য মানে হলো রসূলের আনুগত্য। আবার রসূলের নাফরমানি মানে আল্লাহর নাফরমানি আবার আমীরের নাফরমানি মানে রসূলের নাফরমানি। সুতরাং যারা আনুগত্য করতে অজুহাত পেশ করে তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন উভয় জীবনেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তাদের এই অজুহাত এমন একদিকে প্রবাহিত হচ্ছে যেখানে সত্য গোপন করার কোন অবকাশ নেই। তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা।

অজুহাতের রকমফের রয়েছে। কেউ অজুহাত পেশ করে কাজটি থেকে বাঁচার জন্য। আবার কেউ আছে যাদের অন্তরে নিফাকের গুণ বর্তমান। উদাহরণতঃ দায়িত্বশীল নির্দেশ দিলেন আপনি অমুক দিন অমুক কাজটি করবেন। দেখা গেল সে সেই দিন সেই কাজটি করেনি। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলল, ওটা করলে এই ক্ষতি হতো, বা ওটা করা এখন উচিত হতো না বলে করিনি ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কেউ আছে বলবে, আপনি কিভাবে এই নির্দেশ

দিতে পারলেন। আপনার যোগ্যতাই নেই তানজিম পরিচালনার। অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু। শুধু তাই নয়, অনেক অধিনস্ত দায়িত্বশীল তার উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে গাধা মনে করে। মনে করে, কত বড় বড় জ্ঞানীরা থাকতে এক গাধার পিঠে বোঝা চাপান হলো এটা সত্যিই দুঃখজনক ঘটনা। তারা মনে করে তাদের অন্তরের এই কুটিলতা আল্লাহ জানেন না। তারা কি জানে না বড় বড় যোগ্যতা সম্পন্ন সাহাবী থাকতে ছোট যুবক ওসামা (রাজিঃ) কে সেনাপতি করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসূল। মৃত্যুর যুদ্ধে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত তিন সেনাপতি শাহাদত বরণ করলে সাহাবা আজমাসীন এমন একজন কে নিযুক্ত করেন, যার কুরআন তেমন মুখস্ত নেই, যিনি তেমন হাদিসও বর্ণনা করেন নি। নফল আমল সম্পর্কে তাঁর কোন হাদিস পাওয়া যায় না। তবুও তিনি হয়েছিলেন আল্লাহর তরবারী নামক এক দুর্ধর্ষ গেরিলা কমান্ডো সেনাপতি যার নাম শুনেই শত্রুরা প্রসাব করে দিত। তাহলে, দায়িত্বশীল নিয়ে যারা সমালোচনা না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একনিঃভাবে আনুগত্য করে যায়, দায়িত্বশীলকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়, দায়িত্বশীলের প্রতি অগাধ আস্থা রাখে এবং কোনরূপ সংশয় না রেখে আনুগত্য করে যায়, এমন মামুর দিয়ে যেমন তানজিম উচ্চ শিখরে পৌঁছবে তেমনি এই সব মামুরই সত্যিকার অর্থে একদিন জাতির পরিচালক হবে। আল্লাহর সাহায্য আসবে এসব মামুরের জন্যেই। আল্লাহ আমাদের এমন মামুর হওয়ার তৌফিক দান করুন। আর যারা দায়িত্বশীলকে হয়ে জ্ঞান করে, দায়িত্বশীলকে হীন ও লাঞ্ছিত করার মানসিকতা রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ হেদায়েত পৌঁছান এই দোয়া করি। নতুবা এই মানসিকতার লোকেরা তানজিমের মধ্যে এমন বিষবাল্প ছড়াবে যে, তার দুগন্ধে সবাই নাসিকা কুণ্ঠিত করবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আমিন।

মামুর যদি দায়িত্বশীলের চেয়ে চালাক হয়, তবে আদবের সহিত তাকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। এর বাস্তব উদাহরণ সালমান ফারসি (রাজিয়াল্লাহু আনহু) তিনি রসূলের চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের খন্দক খোড়ার পরামর্শ টি ছিল যথার্থ। যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন। এখন আমি পরামর্শ দিলাম না আবার আমিরের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করলাম। কৈফিয়ত চাইলে অজুহাত পেশ করলাম অথবা আমীরের বোকামি বা অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটলাম এটা কখনও ইসলামী আচরণ হতে পারে না। এরূপ যারা করে আসলে তাদের উপর নফস নামক ইলাহার প্রভাব আছে। যা তার সফলতার পিছনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

অবশ্যই আনুগত্যের ক্ষেত্রে সর্বাগে যে কাজ তা হলো ভালো ভাবে শুনতে হবে। একবার দুই বার প্রয়োজনে তিনবার শুনতে হবে তার পর আনুগত্য করতে যেয়ে কোনো ইজতেহাদ করতে যাওয়া যাবে না। (তবে যদি আমিরের পক্ষ থেকে কম বা বেশি করার অনুমতি থাকে তবে অন্য কথা।) যেমন আমীর আপনাকে বললেন বাজার থেকে আম নাঠের খড়ি আনতে। আপনি হয়তো কাঁঠাল কাঠের অতিব সুন্দর খড়ি আনলেন। এটা চলবে না। কেননা আপনি হয়তো ভাবছেন যে বাড়িই তো তা যে কাঠেরই হোক না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনাকে যে আমকাঠ আনতে বলা হয়েছে এর বিকল্প কাঁঠাল কাঠ হবে না। তাই হয়তো এই কাজটি অন্য কে দিয়ে আবার করাতে হবে। অতএব আসুন অজুহাত, ইজতেহাদ পরিহার করি। আমিন।

সত্য চির অজ্ঞান

বিস্তৃত মাঠ আর বিস্তৃত আকাশ স্রষ্টার নির্দেশন

আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালা প্রায় প্রত্যেক নবী রসূল আলাইহিস সালামকেই বকরী চরিয়ে নিয়েছেন। এর একটি হাকিকতও রয়েছে। বকরীর মতো হ্যাকড়া প্রাণী আমার মনে হয় মানুষ ব্যতীত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বকরীর স্বভাব এমন, আপনি যদি ওর পেছনে চলেন দেখবেন সে একবার এদিক আর একবার ওদিক দৌড় মারছে। আবার যদি আগে চলেন দেখবেন সে কেমন সামনের পা দু'টো মাটিতে খুঁটির মতো গেঁথে দিয়ে আপনার গতি রোধ করে। প্রচন্ড রোদ ভাবছেন বেচারীকে বকরীটাকে একটু পানি খাওয়াই - বেশ তার সামনে ঠান্ডা মিস্টি পানির বালতি রাখুন সে খাবে না। যদি কান দু'টো ধরে পানিতে ঠেসে ধরেন তবে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখবে একটু পানিও খাবে না। মরে যাওয়ার ভয়ে ছেড়ে দিলেন তখন সে নাকে যে একটু পানি আছে তাও ঝাড়া দিয়ে আপনার কাপড় চোপড় নষ্ট করবে। এই হল বকরী।

এই বকরী নিশ্চয়ই ঘরে চরানো যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন খোলা মাঠ। খোলা মাঠ মানেই নির্জন পরিবেশ। খোলামাঠ মানেই তার উপর সুনীল আকাশ। তাই বকরী চরাতে দিয়ে যেমন ধৈর্যের ট্রেনিং হবে শতভাগ তেমনি বিস্তৃত মাঠ আর বিশাল খোলা আকাশ আর নির্জন পরিবেশ তাকে করে তুলবে ভাবুক। আচ্ছা এতবড় আকাশটা কিভাবে ভেসে আছে খুঁটি ছাড়া, কে একে তৈরী করেছেন? বিস্তৃত এত সুন্দর খোলামাঠই বা কে বানিয়েছেন। এসব ভাবনা তাকে ভাবিয়ে তুলবে আর আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। সেই সাথে তার হাজারও প্রশ্নের উদয় হবে মনে এবং সে স্রষ্টার অনুসন্ধানী ব্যক্তিতে পরিণত হবে। শিরকের কালিমা তাকে স্পর্শ করবে না সহজে। আমরা তো জমিদার বা রাজাবাদশার নাতিপুতি তাই বকরী চরা তো দূরের কথা মাঠের বট গাছটা নিয়েও তো ভাববার এক সেকেন্ড সময় হাতে নেই। এই বুঝি ফেসবুকে কোন বন্ধু অপেক্ষা করছে। এই বুঝি কোন বন্ধু আড্ডা দেওয়ার জন্য ডাকছে, এই বুঝি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাক আমি আজ মহাকাশের মহাশূন্যতা নিয়ে দু'চারটি কথা বলতে চাই যেন আমাদের ব্যস্ততার মাঝেও এসম্পর্কে একটি ভালো ধারণা মাথায় থাকে যা আমাদের ঈমানের পথে চলতে সাহায্য করবে।

দিনের বেলায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আকাশের রঙ কি সুন্দর নীল দেখায়। কাছের আকাশে কতো পাখি ওড়ে, শিশুরা ঘুড়ি ওড়ায়। দূরের আকাশে চিল, শকুন ঈগল উড়ে বেড়ায় মনের আনন্দে। কখনও বহুদূরের আকাশে উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার, রকেট ইত্যাদিও আমরা দেখতে পাই।

চিরাচরিত নিয়মে আকাশের গণগণে সূর্যটা একটি সুনিয়ন্ত্রিত আদেশ পালন করে চলছে, চলছে স্নিগ্ধ চাঁদমামাটাও। কার সে নির্দেশ?

সূর্যের আলোর মধ্যে রয়েছে সাতটি মৌলিক রং। সেগুলোকে একত্রে সাদা দেখায়। কে মেশাল এই সাত রংকে একটি রংয়ে?

সূর্য ডোবার সাথে সাথে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার সাথে সাথে নিঃসীম অন্ধকার আকাশের বুক চিরে ক্রমশ একটা দুটো করে তারা ফুটতে থাকে। মনে হয় যেন অদৃশ্য কোন হাত একটার পর একটা আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কার সে নির্দেশ এমন সাজে সাজে রাতের আকাশ?

নিচে গোটা পৃথিবী যেন বিছানা স্বরূপ আর আকাশ বিছানার উপর টাঙ্গানো সামিয়ানা। সেই সামিয়ানার নিচে তারকা গুলো ঝালর বাতির মতো নিবু নিবু করছে। চাঁদ যেন রাতের শোবার ঘরের ডিম লাইট। পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার প্রয়োজন রাতে হয় বৈকি! আহা! কে তবে এমন পৃথিবী বাসির সকলের জন্য শোবার উন্মুক্ত বিছানা তৈরী করল?

রাতের অন্ধকার যতো গাঢ় হয়-ততই তারার প্রদীপের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর কালো আকাশ আস্তে আস্তে ভরে উঠতে থাকে তারায় তারায়। যাঁরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন তারা বলেন, এই সব তারাগুলোকে সবসময় একজায়গায় দেখা যায় না। আকাশের বিভিন্ন স্থানে এরা ঘুরে ফিরে বেড়ায়। ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে এই সব তারাদের কতগুলোর আলো স্থির আর কতগুলোর আলো ঝিকমিক করে জ্বলছে। এদের সকলের চেহারাও একরকম নয়। এই সব তারাদের মধ্যে যাদের আলো স্থিও, তারা হচ্ছে গ্রহ। যেমন আমাদের পৃথিবী। অন্য তারা থেকে যদি আমরা পৃথিবীকে দেখি তবে অন্ধকার রাতে তার আলো দেখাবে স্থির। আর যেসব তারা মিটমিট করে জ্বলে তাদের বলা হয় 'নক্ষত্র'। নক্ষত্রের নিজের আলো আছে। গ্রহদের নিজের আলো নেই। নক্ষত্রের আলোয় এরা আলোকিত হয়। তাহলে বলুন তো নক্ষত্রের মাঝে কে আলো দান করেছেন? নাকি নক্ষত্ররা নিজেরই নিজ গুণে আলোকিত?

আর কেই বা গ্রহ থেকে আলো হরণ করেছেন? না কি তারা নিজেরাই নিজ গুণে আলোহীন?

নক্ষত্র যেমন ক্ষুদ্র আছে তেমনি দানবাকার নক্ষত্রও আকাশে রয়েছে। সূর্য তেমনি একটি নক্ষত্র। সূর্য আমাদের খুব কাছের নক্ষত্র। অন্যান্য নক্ষত্ররা পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসুদ্ধ সৌরজগতের আরও কিছু গ্রহ নিরন্তর আবর্তিত হয়ে চলেছে। এসব গ্রহ কি নিজেরই আবর্তিত হচ্ছে নাকি কেউ তাদের আবর্তিত করছেন?

নক্ষত্ররা অনেক দূরে আছে বলে তাদের ছোট দেখায়। আসলে এরা একেকটা অনেক অনেক বড়। কিছু কিছু নক্ষত্র আছে যেগুলো কয়েক লক্ষ (প্রায় তের লক্ষ) পৃথিবী জোড়া দিলে যতটুকু হবে-তার সমান। আবার কখনও তার চেয়েও অনেকগুণ বড়ো। পৃথিবীর সমান বা পৃথিবীর চেয়েও ছোট আকারের নক্ষত্রও রয়েছে মহাকাশের মহাশূন্যতায়। কোন সে সত্তা নক্ষত্রগুলোকে ছোট ও বড় করেছেন? না কি এরা নিজেদের শক্তিতেই ছোট আর বড়? রাত্রির আকাশে নক্ষত্র ছাড়া আর যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে চাঁদ। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। উপগ্রহ হচ্ছে এমন জিনিস- যা গ্রহের চারদিকে ঘোরে। চাঁদও তেমনি পৃথিবী নামের গ্রহটির চারপাশে আবর্তিত হয়। চাঁদ হচ্ছে আয়নার মতো বস্তু। সূর্যের আলো এতে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। কোন সে শক্তি যা চাঁদ ও সূর্যকে এমন কায়দায় সেট করলো যে সূর্যেও আলো চাঁদে প্রতিফলিত হচ্ছে? না কি এমনি এমনি তারা এমন মাপে সেট হয়েছে?

চাঁদের চেহারাও আকাশে সবসময় একরকম থাকে না-বদলে যায়। কখনও দেখা যায় সে পুরোপুরি থালার মতো গোল, কখনও আবার ছোট হতে হতে একে বারে মিলিয়ে যায়। তখন তাকে আমরা বলি অমাবস্যা। পরদিন থেকে আবার একফালি কাস্তুর মতো চেহারা নিয়ে চাঁদকে আকাশে দেখা যায়। তারপর প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে সেটা হয়ে ওঠে পুরোপুরি গোল। এটাই পূর্ণিমার চাঁদ। কোন সে জন যার ইচ্ছায় এটা ধীরে ধীরে গোল হয়? নাকি এমনি এমনিই?

আকাশে গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র ছাড়াও আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ। চলতি ভাষায় আমরা যাদের বলে থাকি গ্রহাণুপুঞ্জ। এছাড়া অনেক সময় অন্ধকার রাতে দেখা যায় একটি আলোকপথ আকাশকে প্রায় দ্বিখন্ডিত করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই উজ্জ্বল আলোকপথকে বলা হয় আকাশগঙ্গা। ইংরেজিতে এর নাম Milky way। বাংলায় বলা হয় ছায়াপথ।

তাহলে এই আকাশ গঙ্গা কি নিজেই নিজের স্রষ্টা নাকি তার কোন স্রষ্টা আছে?

বহুদূরের নক্ষত্রদের মাঝখানে তুলোর মতো আবার কখনও ধোঁয়ার মতো উজ্জ্বল মেঘপুঞ্জ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধোঁয়ার মেঘকে বলা হয় নীহারিকা। এই নীহারিকাদের মধ্যে কেউ খুব বেশি উজ্জ্বল, আবার কেউ অনুজ্জ্বল। কোনটি দেখতে গোলাকার, কোনটি আবার ডিমের মতো উপবৃত্তাকার। এই সব নীহারিকা থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। কল্পনাও বাইরে যে, নীহারিকা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কয়েকশত কোটি বছর লেগে যায়। এরা যে কতো দূরে রয়েছে তা কল্পনা করাও কঠিন। জ্বলন্ত গ্যাসের অতিকায় এক একটি পিন্ড হচ্ছে এই নীহারিকা। কে আছে বলবে যে, এগুলো তার নানা বা দাদা সৃষ্টি করেছেন, এক আল্লাহ ব্যতীত? আছে কেউ দাবীদার?

আজ সারা বিশ্বে মুসলিমদের অধঃপতন আর বেঈমানদের সংখ্যাধিক্যের পিছনে এটাও একটা কারণ যে, আসলে মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরূপণের সামান্য চেষ্টাও করে না। আল্লাহর নির্দশন নিয়ে গভীর মনোযোগী চিন্তাশীল হয় না। ফলে তারা আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর মর্যাদার গুরুত্ব, আল্লাহর ভয় ইত্যাদির পরিবর্তে গয়রুল্লাহর ইবাদতে মশগুল। একনিষ্ট ঈমানদারদেরও ঈমান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে যদি আল্লাহর নির্দশন গুলো নিয়ে গবেষণা বা চিন্তা করা হয়।

তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা স্বয়ং ঘোষণা করেছেনঃ

অর্থাৎ তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারে নি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।' (সূরা যুমার : আয়াত নং ৬৭)

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

অর্থাৎ একজন ইহুদী পণ্ডিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদদ, আমরা (তওরাত কিতাবে) দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সৃষ্টিতত্ত্বকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই রাজা/সম্রাট। (কিতাবুত তাওহীদ পৃষ্ঠা নং ১৯৯)

এ কথা শুনে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী পণ্ডিতের কথার সমর্থনে এমনভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াতটুকু পাঠ করলেন।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোতে নাড়াচাড়া দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।' (সুরা যুমার আয়াত ৬৭)

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ সুবহানুহু তা'আলা সমস্ত আকাশমন্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, 'আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?' (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তা'আলার হাতে তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মতো। (কিতাবুত তাওহীদ পৃষ্ঠা নং ২০০)

ইবনে যায়েদ বলেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

'কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের (মুদ্রার) মতো।' তিনি বলেন, 'আবু যর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি-

'কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, এটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের মতো। তিনি বলেন, আবু যর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি, 'আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূ-পৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো। (তাফসীরে ত্বাবারানী, হাদীস নং ৪৫২২, বায়হাকী হাদীস নং ৫১০)

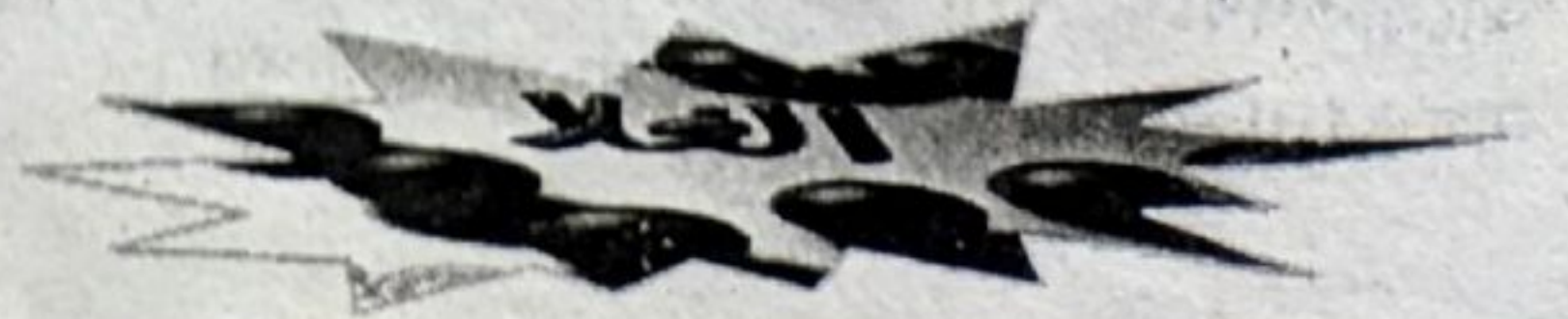
ইবনে মাসউদ (রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'দুনিয়ার আকাশ এবং পরবর্তী আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। এমনভাবে সপ্তাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের

পথ। একইভাবে কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তা'আলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যিরর হতে, এবং যিরর আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবু ওয়ায়েল হতে, এবং তিনি আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।) কিতাবুত তাওহীদ পৃষ্ঠা নং ২০২

আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

অর্থাৎ তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশত বছরের পথ। সপ্তাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তা'আলা এর ওপরে সমাসীন রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকাণ্ডই তাঁর অজানা নয়।' (আবুদাউদ হাদীস নং ৪৭২৩, মুসনাদ আহমদ, ১/২০৬, ২০৭)

প্রিয় পাঠক! আমরা শুরুতে যে আলোচনা করেছিলাম আকাশ সম্পর্কে। এবং অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল। এসব প্রশ্নের উত্তর আপনি যাকেই জিজ্ঞাস করবেন, সেসই বলবে যে আল্লাহ। তবুও কেন সকল মানুষ ঈমানদার নয়? হ্যাঁ, আল্লাহকে শুধু সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা বলে বিশ্বাস করলেই হবে না। বরং তাওতকে অস্বীকার করতে হবে তাওতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তারপর আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে। বিশ্বাসের পাশাপাশি আল্লাহর আইন মান্য করতে হবে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে হবে। নতুবা শুধু বিশ্বাস করলেই পার পাওয়া যাবে না। এজন্যই তো ঈমান আনার শর্ত তিনটি। মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা ও আমলে বাস্তবায়ন করা। এই তিন শর্তছাড়া শুধু বিশ্বাস করে আমল না করলে কোন লাভ নেই। আল্লাহ আমাদের প্রকৃত তওহীদের জ্ঞান দান করুন ও তওহীদ মান্যকারী ও প্রতিষ্ঠাকারীর কাতারে शामिल করুন। আমিন।



কেন এই সাময়িকী?

“ কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত, তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহু করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যের।” (সূরা আল-আসর : ১-৩)।

“ বলুন, (হে নবী সঃ) এটাই আমার পথ; আমি সজ্ঞানে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও আল্লাহর দিকে আহ্বান করে।” (সূরা ইউসুফ : ১০৮)।

“ হে নবী (সঃ)! মুমিনদেরকে কিতালের দিকে উৎসাহিত কর।” (সূরা আনফাল : ৬৫)

মহান রব্বুল আলামীনের ভাষ্যে এসেছে, “নিশ্চয় ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ তা’য়ালার একমাত্র ধীন।” (সূরা আল-ইমরান : ১৯)।

“ আমি তোমাদের জন্য এই ধীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছি, যথাযথ করেছি।” (সূরা আল-মায়িদা : ৩)।

“ ধীন হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কেউ অন্বেষণ করলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা আল-ইমরান : ৮৫)।

ওস্তাদ কুতুব (রঃ) বলেন, কোন ধনবান ব্যক্তি কারও কাছে অর্থ-সম্পদ ধার চাওয়ার আগে অবশ্যই তার ভান্ডার দেখে নেবে, যথেষ্ট সম্পদ তার কাছে আছে কি-না? কারণ সে জানে, ঋণ পর্যায়েক্রমে দাসত্ব শিক্ষা দেয়। কিন্তু আফসোস শুধু বর্তমান নামধারী মুসলিমদের জন্য, তারা পশ্চিমাদের জীবন পদ্ধতি ধার করে আনছে অথচ তার নিকট রক্ষিত মহা ধনভান্ডার ‘আল-কুরআন’ খুলে দেখারই প্রয়োজন অনুভব করে না। (ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার)।

এটা পরিস্কার যে, পশ্চিমা জীবন ধারার দিকে যে যতটুকু ঝুঁকে পড়বে ইসলাম থেকে সে ততই সরে পড়বে। চূড়ান্ত পর্যায়ে দুনিয়ার জীবনে সে বিলাসিতা পেলেও আখেরাতে জাহান্নামই হবে তার আবাস। কারণ, পশ্চিমারা মানুষের পর্যায়ে তো নেই-ই বরং পশুর সমতুল্য।

আল-কুরআনের বর্ণনানুযায়ী পশুর চেয়েও তারা বিভ্রান্ত। তাদের জীবনের লক্ষ্যই হল, ‘খাও-দাও আর ফুটি কর।’ সুতরাং পশ্চিমা জীবন ধারার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরী করাই আমাদের ঈমানের দাবী; আর এজন্য পূর্ণাঙ্গ ধীন হিসেবে ইসলামের উপস্থাপনা অতীব জরুরী। আমরা প্রত্যেকেই এই তত্ত্বটি মুখস্ত পেয়েছি “Islam is the complete code of life.” তথা ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।” কিন্তু ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি ও জীবন পরিচালনার

বিভিন্ন পর্বে এ তত্ত্বের বাস্তবতা কতটুকু তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেছে অথবা এই তত্ত্বের ব্যখ্যা উপস্থাপনে আমরা অক্ষম। এই অক্ষমতা নিরসনে আমাদের এই সাময়িকী “আল-ফুরকান” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমরা এমনটিই মনে করছি, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহর নিকট তাওফিক কামনা করছি।

রব্বুল আলামীনের ভাষ্যে এসেছে, “ আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, ‘কেন একটি সূরা নাযিল হয় না? কিন্তু যখনই বিধান সম্বলিত কোন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যদি কিতালের কথা থাকে তাহলেই তুমি দেখবে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মৃত্যুভয়ে মূর্দাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উন্টিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের জন্য দুর্ভোগ!’” (সূরা মুহাম্মাদঃ ২০)।

আমরা মুসলিম সমাজে এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই ‘কিতালভীতি’ হচ্ছে একটি ঈমান বিধ্বংসী রোগ, এই রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিকে মুনাফিক-ফাসিক বানাতে পারে। এমনকি সে কুফরীতেও প্রত্যাবর্তন করতে পারে। আল্লাহর কিতাবের প্রায় শতাধিক আয়াত এটাই স্বাক্ষর দেয়। সুতরাং ‘কিতালভীতি’ নামক রোগটির আদ্যোপান্ত তুলে ধরে সকলকে সাবধান করতে এই সাময়িকী তথা ‘আল-কুরআনের আহ্বান’ যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করছি।

আমরা মুসলিম সমাজে স্পষ্ট করতে চাই, “জিহাদ-কিতাল ছাড়া উপায় নেই।” জিহাদ-কিতালে রয়েছে মুসলিমদের ইজ্জত-সম্মান, দুনিয়ার নেতৃত্ব ও দারিদ্র বিমোচনের মধ্য দিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা। “আর জিহাদ-কিতাল বিমুখতায় আসে অপমান, হীনতা ও বাতিলের প্রতি বশ্যতার মধ্য দিয়ে পরকালীন ক্ষতির পথে প্রশস্ততা।”

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্য দ্বারা মুসলমানদের অতীত-বর্তমান পর্যালোচনা করে মুসলিমদের মাঝে আমরা উক্ত শ্লোগান ৩টি মজবুত করে গেড়ে দিতে চাই, এজন্যই এ সাময়িকী। সুতরাং সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা’য়ালার-ই জন্য- আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা মুখোশ উন্মোচন করে দিতে চাই জিহাদ বিমুখ কথিত দা’য়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলো সম্পর্কে যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে শিকড় বিস্তার করে মুসলিমদেরকে নির্বীণ বানাচ্ছে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানতাবশত। এজন্যই এ সাময়িকী।

আমরা মহান রব্বের নিকট এই সাময়িকীর ধারাবাহিকতা কামনা করছি এবং প্রত্যেক পাঠকের নিকট আমাদের সং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহর নিকট দু’আর অনুরোধ করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল কর ॥ আমিন ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ব তাগুতের বিরুদ্ধে: রুখে দাঁড়াও মুসলিম

“অর্ধপৃথিবী করেছো শাসন ধূলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে খসি।”

-----কাজী নজরুল ইসলাম

আহা! আহা! হা! বুকটা ফেটে যাবে বোধকরি। যে বিশ্বে অর্ধেকটাই মুসলিম জাতি শাসন করেছে সেই বিশ্বে আজ তার উদ্বাস্তু, ক্ষমতাহীন, নিজ দেশে প্রবাসীর মতো তারা আজ দিশেহারা।

আমরা জানি, আল্লাহ-সুবহানু ওয়াতায়াল্লা যুগে যুগে দিশেহারা মানুষকে পথের দিশা দেওয়ার জন্য কিছু যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করেন। তারা আর সকল মানুষকে ব্যতিক্রম। তারা অধিকাংশের মতো নয়। তারা স্রেফ নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অকাতরে সব বিলিয়ে দেন। এই উপমহাদেশে যখন শিরক বেদাআতের সয়লাব বইছিল তখন শক্ত হাতে শিরক বেদাআতের বিরুদ্ধে সঠিক দ্বীনের প্রসার ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (রহমাতুল্লাহে আলাইহে)।

সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন শেরহিন্দের সূর্য মুজাদ্দের আলফেসানী (রহমাতুল্লাহে আলাইহে)।

তাতারী শাসকদের তাগুতী সংবিধান ইয়াসেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহে)।

মধ্যপ্রাচ্যের তাগুতী সরকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন মোল্লা উমর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।
সারাবিশ্বের তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেন আলকায়দা সংঘঠনের প্রধান ওসামা বিন লাদেন।

ভারতের তৎকালীন হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কাশেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহে)।
বঙ্গদেশের হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন শাহজালাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহে)।

বর্তমান বাংলাদেশের তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন শায়খ আব্দুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

অর্থাৎ সবদা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশেই তৎপরতা চলছে। তবে অত্যন্ত দীর্ঘ গতিতে। কেননা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলিম দের মধ্যে তীব্র কোন আকাজ্খা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা তীব্র আকাজ্খা ব্যক্ত করণ পূর্বক জানমাল কুরবান করছেন তাদেরকে যথাযথ সাহায্যও করা হচ্ছে না। এছাড়াও আরও একটি সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা হলো এতসব

সমস্যা সত্ত্বেও মুসলিম জিহাদী কাফেলার মধ্যবর্তী কোন্দলও কম ক্ষতিকর নয়। প্রতিটি দলের মধ্যেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে যারা দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পায়তারা করতে থাকে। এবং সামান্য সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করে না। তাদের বিভ্রান্তির ফরে সাধারণ যারা আনসার তারা হয়ে পড়েন দিশেহারা। তাদের প্রশ্ন তারা কোনদিকে ধাবিত হবেন।

এই সমস্যা সমাধানের অনেক পথ অবলম্বন করা যায়। যেমন এই সমস্যা যারা করছে অর্থাৎ যারা বিদ্রোহ করছে তারা অবশ্যই কোন বাহানা দেখিয়ে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করার দাবি করবে। তাই তারা যে বাহানা গুলো দেখালো সেগুলো গবেষণা করা যে, তাদের আনুগত্যের বায়আত ভেঙ্গে গেছে কিনা?

দ্বিতীয়ত তাদের অভিযোগ গুলো ক্ষতিয়ে দেখা যে, সেগুলো যুক্তি সংগত কিনা?

তৃতীয়ত তাদের দুরূহিসন্ধির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কে কে সহযোগীতা করছে? কেন করছে?

চতুর্থ তাদের সার্বিক সমস্যা সমাধানে যে দল আল্লাহর ও রসুলের প্রদত্ত ফয়সালা মেনে না নিবে তাদের মুনাফিকির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং তাদের কে এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাদের কে সবদা শত্রুই মনে করতে হবে। কারণ তারাই বিদ্রোহী, তারা যে কোন সময় মুসলিম জামায়াতের সর্বনাশ করতে পিছপা হবে না। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি অথবা একাধিক ব্যক্তি আনুগত্যের বায়আত নেওয়ার পর জামায়াত ত্যাগ করে তবে তার জন্য এটা জায়েজ হতে হলে আমীরের কোন প্রকাশ্য কুফরীর প্রকাশ পেতে হবে। এমন যদি না ঘটে এবং মিথ্যা কিছু অজুহাত পেশ করে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয় তবে তাদের বিচারের আওতায় নিজেদের পেশ করতে হবে। তাদের ক্ষমা চাইতে হবে সেই আমীরের নিকট যাদের হাতে তারা বায়আত গ্রহণ করেছে। এটা করতে হবে তাদের কে পাকড়াও করার আগেই।

আর যদি তারা (বিদ্রোহীরা) ক্ষমা না চায়, বিদ্রোহের পথ থেকে ফিরে না আসে তবে সেই তথাকথিত বিদ্রোহীদের সাথে কোন সৌজন্য মূলক আচরণ করা যাবে না। তাদের সালাম দেয়া, জায়গা দেওয়া, তাদের সামান্যতম কোন উপকারও করা জায়েজ নেই। শুধু তাই নয়, তারা পানির অভাবে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও তাদের একফোটা পানি দেওয়াও জায়েজ নেই। অথচ কুকুরকে পানি দিলে আল্লাহ চাহেন তো মুক্তিও মিলতে পারে।



একটি বিশেষ ঘোষণা

সাময়িকীটি নিজে পড়ুন অন্য কে পড়তে দিন। আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করুন কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে। সেই সাথে এই সাময়িকীর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

যে আদর্শ চির অনুসরণীয় অনুসারীদের মাঝে অবস্থান কালে রসূল (সাঃ)-এর আচরণাবলী

“(হে নবী সঃ)! নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।” (সূরা আল-ক্বালাম : ৪)।

“নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর তাদের জন্য।” (সূরা আল-আহযাব : ২১)।

“নবী (সঃ) বলেন, উত্তম চরিত্র গুণসমূহকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।” (আহমাদ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)।

মহান রসূল আলামীনের ঘোষণায় এসেছে, (হে মুমিনগন)! তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই রসূল (সাঃ) এসেছে, তোমাদের প্রাপ্ত কষ্ট তাকে (সাঃ) অত্যন্ত আহত করে। তিনি (সাঃ) সর্বদাই তোমাদের সর্বোচ্চ কল্যানকামী। তিনি (সাঃ) মুমিনদের প্রতি পূর্ণমায়ায় কোমল, বিনয়ী ও মমতাময়। (সূরা আত তাওবাহ : ১২৯)

হাদীস গ্রন্থসমূহের সংকলক, ভাষ্যকার ও সীরাত রচয়িতাগণের বর্ণনায় ঐক্যমতের সাথেই এটা উঠে এসেছে যে, নবী করীম (সাঃ) অনুসারীদের সাথে চলাফেরা বা অবস্থান করার মূহর্তগুলোতে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন আদল ইনসাফ বজায় রাখতেন, এর মাধ্যমে একজন সফল নেতার মধ্যে যে ধরনের সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি প্রয়োজন যা পুরোমায়ায় উপস্থিতি ছিল। ফলপ্রসূতিতে, নবুয়াতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েও তৎকালীন সময়ে এবং পরবর্তী যুগসমূহের কুফ্যার পন্ডিতেরাও তাদের গবেষণায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সর্বযুগের সবচেয়ে সফল নেতা ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের ধারক হিসাবে মেনে নিয়েছেন। আমরা জানি, ব্যক্তিত্ব বলা হয়ে থাকে ব্যক্তি চরিত্রের এমনসব উপাদান বা গুণাবলিকে যা অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। সুতরাং, যার ব্যক্তিত্ব যত সমৃদ্ধ হবে নেতা হিসাবে তার গ্রহণযোগ্যতা ততই বৃদ্ধি পাবে, এটা অত্যন্ত সহজবোধ্য বিষয়। ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাই সহ আরও ইমামগন ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেনঃ আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রসূল (সাঃ) এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন কুরআনই ছিল তার চরিত্র। অর্থাৎ, কুরআন তাকে যে নির্দেশই দিত তা তিনি পালন করতেন এবং যা থেকে তাকে নিষেধ করা হত তা তিনি (সাঃ) পরিহার করতেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় ঘোষণা হল, “সত্য ও ন্যায়ে কুরআনের বানী পরিপূর্ণ। (আল আল আনআম ৬:১১৫)। তাহলে ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামষ্টিক পরিসরে সামাজিক

ও রাষ্ট্রীয় পর্বগুলোতে তার (সাঃ) চেয়ে উত্তম পরিচালক, উত্তম সংগঠক, উত্তম বিচারক, উত্তম নেতা আর কে হতে পারে? মানুষের মধ্যে তার (সাঃ) চেয়ে বেশী অনুসৃত ও বেশী আনুগত্য পাবার দাবীদার আর কে হবে? নিশ্চয়ই অন্য কেউ নয়, আমরা এখন তুলে ধরব অনুসারীদের মাঝে অবস্থানকালীন নবী (সাঃ) কোন মূহর্তে কেমন আচরন বজায় রাখতেন, কোন ইসলামী নেতার জন্য নবী (সাঃ) কে অনুকরণ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছে তার জন্য এটা হবে অতিরিক্ত সাপোর্ট, যার মধ্যে ঘটিত রয়েছে তার জন্য উপদেশ ও স্বরনিকা এবং অন্য সকলের জন্য বিশেষত কর্মী ও ভাবী নেতৃবৃন্দের জন্য মূল্যবান দারস ইনশাআল্লাহ।

১. বিনয়-নম্রতা-কোমলতা :- পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, “(হে নবী!) তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি বিনয়ের ডানা মেলে দাও।” (সূরা আশ-শুআরাঃ ২১৫, সূরা আল-হিজর : ৮৮)।

নিঃসন্দেহে রসূল (সাঃ) এই আয়াতের উপর পুরোপুরি আমল করেছেন, যথাযথভাবেই এই নির্দেশের হুক আদায় করে গেছেন। এর প্রমাণ হল পবিত্র কুরআনের ঐ সত্যায়ন এবং তাঁর (সাঃ) অনুসারীগণের মধ্যে যারা তাঁর (সাঃ) সংগী-সাথী তথা সহচার্যে ধন্য হয়েছিলেন সেই সকল মহান ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর। ঐ সকল মহান ব্যক্তিবর্গ তথা সাহাবাগণ (রাঃ) প্রদত্ত স্বাক্ষর হাদীস সংকলক ইমাম, তাফসীরকারক, ও সীরাত রচয়িতাগণ নকল করেছেন এভাবে যে, নবী (সাঃ) কথা বলতেন নীচু আওয়াজে, প্রয়োজনীয় বিষয় পুনরাবৃত্তি করতেন, সর্বদা মৃদু হাসি মুখ বজায় রাখতেন তথা কারো প্রতি মুখ গোমড়া করতেন না; সংগীদের বা অনুসারীদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতেন না, তাদের প্রতি রাগান্বিত হতেন না, তিরস্কার ভৎসনা বা নিন্দা করতেন না, সর্বোচ্চ ক্ষমা পরায়নতা ছিল তার (সাঃ) স্বভাব, অশ্লীলতা ভাষার প্রয়োগ বা গালি-গালাজ কখনোই করেন নি।

তিনি ছিলেন এতটাই ইনসাফপূর্ণ যে, কোন একজন অনুসারীও তার (সাঃ) বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার বা এমন কোন আচরনের অভিযোগ আনেননি যা বিনয় নম্রতা ও কোমলতার পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হতে পারে। তবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বাস্তবায়নে কিংবা জিহাদের ময়দানে কঠোরতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কারণ এ দু’টি ক্ষেত্রে নির্ধারিত কঠোরতাই হল ইনসাফ। এছাড়া তিনি (সাঃ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনোই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি বরং ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। সালাম প্রদানে তিনি ছিলেন অগ্রগামী, অহংকার বলতে যা বুঝায় তার লেশমাত্রও তাকে স্পর্শ করে নি। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তিনি ছিলেন নিরাপদ দূরত্বে।

আমরা তাঁর কোমলতা পর্বে উল্লেখ যুদ্ধের কঠিন মূহর্তের সেই ঘটনাটি স্মরণ করব, যেখানে যুদ্ধের শৃংখলা পরিপন্থী বিপর্যয় তরান্বিতকারী ভুল করা সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) ঐ ভুলকারী সাহাবাগণের (রাঃ) প্রতি কঠোর হন নি। কারণ, যা হবার তা হয়েই গেছে, এখন কঠোরতার ফল হবে নতুন বিপর্যয়ের পথ প্রশস্তকারী বৈ আর কিছু

নয়। পবিত্র কুরআন উক্ত কোমলতার সত্যায়ন ও প্রশংসা করেছে এভাবে, “অতএব আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছিলে; আর তুমি যদি কঠোর স্বভাবের হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংগ ত্যাগ করত। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর এবং কার্য সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।” (সূরা আল-ইমরান : ১৫৯)।

এমনি ভাবে রসূল (সঃ) তাঁর উম্মতের মাঝে বিনয়-নম্রতা-কোমলতার প্রসারে ঘোষণা করেছেন, “প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও মুখের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।”

“তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, রাগারাগি করো না, পরস্পরকে ক্ষমা করো, বিনয়ী হও, গালি দিও না, সালামের প্রসার ঘটাও, পরস্পর কল্যাণকামী হও, একে অন্যের জন্য দু’আ, ইস্তেগফার কর, একে অন্যের উপর বংশ-মর্যাদার বা আভিজাত্যের অহংকার করো না, অসুস্থ্যতা একে অন্যের সেবা কর, বিপদে ও সংকর্মে পরস্পর এগিয়ে আস ইত্যাদি নির্দেশাবলী সম্বলিত প্রচুর সংখ্যক হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আমরা পাঠকদের জন্য পরবর্তীতে মূল হাদীসগুলো সংশ্লিষ্ট পর্বে তুলে ধরব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে মুমিনদের প্রতি সর্বোচ্চ মাত্রায় বিনয়-নম্র-কোমল ও সহনশীল হওয়ার সুযোগ দান করুন।

২. অনুসারীদের মাঝে উপস্থিত থাকাকালীন অন্যান্যদের মতই উপস্থিত কাজে পূর্ণমাত্রায় শরীক হতেন শ্রে’মানব মুহাম্মাদ (সঃ)। একবার সফরের সময় খাবারের আয়োজন পর্বে ছাগল রান্না করার উপর ঐক্যমত হলে কর্ম বন্টনের বেলায় কেউ ছাগল যবেহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার, কেউ চামড়া খসানোর, কেউ গোশত কাটার, কেউ রান্না করার দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ নিজ নাম প্রস্তাব করে এগিয়ে আসতে থাকলে নবী (সঃ) বললেন, আমি লাকড়ি সংগ্রহ করব। সাহাবীগণ (রাঃ) বলে উঠলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! (সঃ) আমরা আপনার কাজ করে দিব। নবী (সঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি খুব ভাল ভাবেই জানি যে, তোমরা আমার কাজ করে দিবে, কিন্তু আমি এটা চাই না; কারণ এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করি না। অতঃপর তিনি উঠে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ।

একই ভাবে আহযাবের যুদ্ধে খন্দক খননে নবী (সঃ)-এর মাটি খনন, উত্তোলন ও বহনের কাজে অংশগ্রহণ তো সর্বজন বিদিত। আর হাদীস ও সীরাত গ্রন্থগুলো এ জাতীয় অনেক ঘটনারই স্বাক্ষী। এ জাতীয় দৃষ্টান্তে অনুসারীদের মাঝে তৈরী হয় অনুপ্রেরণা, নেতার প্রতি বেড়ে যায় আস্থা, বিশ্বাস ও আনুগত্যের মাত্রা। আল্লাহ সুবহানাহ তা’আলা আমাদেরকে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত চর্চার তাওফীক দিন। আমীন ॥

প্যারিস অভিযান

নতুন বর্ষের শুরুতেই বরকতময় প্রতীক্ষিত প্যারিস

অভিযান : মহান আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে

প্রত্যাশার যথাযথ প্রাপ্তি। আলহামদুলিল্লাহ।

“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে লানত প্রাপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে অপমান জনক-লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। লানত প্রাপ্ত অবস্থায় এদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং কঠিন ভাবে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহর সুন্যাহ, যা পূর্ব হতেই চলে আসছে। আল্লাহর সুন্যাহতে কোন পরিবর্তন পাবে না।” (সূরা আল-আহযাব : ৫৭, ৬০-৬২)।

“কাফিররা যেন কখনোই মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। নিশ্চয়ই তারা শাস্তি হতে বাঁচতে পারবে না।” (সূরা আনফাল : ৫৯)।

কাব বিন আশরাফ-আবু রাফে থেকে শুরু করে হুমায়ুন আজাদ, খাজা বাবা (আহমেদ রাজীব হায়দার), সবশেষে চলমান বর্ষের জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহে ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মুসলিম উম্মাহর দুই সহোদর বীর কর্তৃক চার্লি হেবাদা পত্রিকার সম্পাদক, কার্টুনিস্ট, সাংবাদিক সহ ১২ শয়তানের হত্যার মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে যমীন বাসীকে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা আবারো স্মরণ করানো হচ্ছে। আল্লাহ, রসূল (সঃ) ও ইসলাম নিয়ে যারা কটুক্তি করবে, আল্লাহর লানত নিয়ে তাদেরকে ঘুরতে হবে, যতই নিরাপদ নগরী কিংবা দুর্গ হোক, কোথাও তারা নিরাপত্তা পাবে না, কেউ তাদের সহায় হবে না। আল্লাহর সিদ্ধান্ত মতই নির্দিষ্ট সময়ে তাদের উপর দুনিয়ার শাস্তি কার্যকর হবে, যা হল যথাযথভাবে হত্যা করা। এছাড়া পরকালীন শাস্তি তো আছেই।

মুসলিম উম্মাহর অজ্ঞ, কুলাংগার, পথভ্রষ্ট ও শয়তানের অনুসারীরা ছাড়া প্যারিসের এই অভিযানে সকলের অন্তরে প্রশান্তি এসেছে। এসেছে ঈমানের সজীবতা, মুজাহিদদের প্রতি আরো আস্থা ও অন্তরের

ফিসাবিল্লাহর বিশ্লেষণ

অন্তঃস্থল হতে দু'আ। “হে আল্লাহ! তুমি ঐ দুই ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নাও, তুমি তোমার ওয়াদা অনুযায়ী তাদেরকে দাও যথাযথ প্রতিদান এবং যারা বিভিন্ন ভাবে উক্ত হামলায় সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তুমি তাদেরকে দান কর ইস্তেক্‌মাত, রহমত ও বরকত।

রবুল আলামীনের ভাষ্যে আমাদেরকে ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে এভাবে, “বল, হে কাফিরের দল! তোমরা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছ আমাদের বিপর্যয়ের? অথচ আমরা তো পাব দু'টি কল্যাণের যে কোনটি। আর দু'টি কল্যাণ হল-

১. শাহাদাত

২. বিজয়।

অন্যদিকে আমরা তো তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি, হয় আল্লাহ আমাদের হাত দ্বারা তোমাদেরকে আযাব দিবেন অথবা তার পক্ষ হতে সরাসরি আযাব পাঠাবেন। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।” (সূরা আত-তাওবাহ : ৫২),।

আলহামদুলিল্লাহ, প্যারিস অপারেশনে মুজাহিদগণ পূর্ণ সফলতা পেয়েছে। এমনকি এটাও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহ তা'য়ালা আমাদেরকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশীই দিয়েছেন। কেননা-

১. টার্গেটের সকলকে সহ আরও সহযোগী শয়তান হত্যা করা গেছে।

২. বন্দী না হয়ে মুসলিম দুই বীর শাহাদাহ (ইনশা আল্লাহ) পেয়েছেন।

৩. ফ্রান্স সহ ইউরোপ জুড়ে কুফরারদের অন্তরে ইরহাব তথা 'ত্রাস' সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

৪. এই অপারেশন হয়েছে জিহাদ সমর্থক ভাইদের জন্য আরও একটি মডেল। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

আমরা আমাদের মুজাহিদ শাইখদের সুরে সুর মিলিয়ে সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব কুফরারদের উদ্দেশ্যে বলছি, “তোমাদের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অংশ যদি হয় আল্লাহ, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সঃ) কে কটুক্তি করা, তাহলে শুনে নাও, দ্বীন ইসলাম আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, সুযোগ পেলেই তোমাদেরকে হত্যা করার।” আল্লাহ আকবার কাবীরা ॥

মূল : শায়খ আবু মুসআব আস সূরী

অনুবাদ : আত তাওহীদ মিডিয়া গ্রুপ, সূত্র : দামুইয়া

যুগ পরিক্রমা : অব্যাহত ত্যাগ আর কুরবানীর মধ্য দিয়ে নতুন শতকের সূচনা যুগেই বৈশ্বিক পরিসরে ইসলামী জিহাদের স্বর্ণালী অতীতের পুনঃ আগমনের পূর্বাভাস!

“জিহাদের মাধ্যমে তোমরা পাবে ক্ষমা, জান্নাত এবং এমন অবস্থা যা তোমরা ভালবাস, তা হল- আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং নিকট বিজয়।” (সূরা আস-সফ : ১০-১৩)।

“রসূল (সঃ) বলেন, আমার উম্মতের একদল ক্বিয়ামতের আগমন পর্যন্ত ক্বিতাল করতে থাকবে এবং তারা শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে।” (বুখারী)

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বক্তব্য এবং ইসলামের অতীত ও বর্তমানে বাস্তবতা পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে এটা অত্যন্ত সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, ইসলামী জিহাদ রবুল আলামীনের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বড় রহমত, অনেক বড় উপহার, যার উদ্দেশ্যই হল মুসলিমদেরকে যমীনের বুকে একচ্ছত্র নেতৃত্বের আসীনে অধিষ্ঠিত করা এবং কুফরারদেরকে সবদিক হতেই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা। কারণ আল্লাহর ঘোষণা হল, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আর যারা কুফরী করে ও আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে তারা সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (৯৮, ৬-৭; ৮, ২২:৬০)।

সুতরাং আমাদেরকে প্রথমেই এ তত্ত্বটি মনে রাখতে হবে যে, ‘জিহাদেই ইজ্জত, সম্মান, নিরাপত্তা, ধনাঢ্যতা, নেতৃত্ব ও পরকালীন মুক্তি। বিপরীতে জিহাদ বর্জনে আসে হীনতা,

অপদস্থতা, কুফ্যারদের নিকট অধীনস্থতা ও পরকালীন শাস্তির দিকে অগ্রসরতা।’

আমরা দেখতে পাই, নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হতে ধৈর্য, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে ১৩ বৎসরের মাকী জীবনে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ) সংগী সাথী পেয়েছিলেন মাত্র ১০০ বা কিছু বেশী। কিন্তু হিজরতের ঠিক পর পরই আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা হল- “আল্লাহ নিশ্চয়ই মুমিনদেরকে প্রতিরক্ষা দিবেন এজন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, নিশ্চয়ই একদিন মুসলিমরা নির্যাতিত ছিল; আর আল্লাহ ঐ মুমিনদের বিজয় দানে অবশ্যই সক্ষম।” (সূরা হাজ্জ্ব ৪ ৩৮-৩৯)। সুবাহানাল্লাহ! যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার সাথেই বলে দেয়া হল- এটা হল মুমিনদের প্রতিরক্ষার জন্য, প্রতিশোধের জন্য, বিজয়ের জন্য। এবার দেখুন, যেখানে ১৩ বৎসরে সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ১০০ জনের কিছু বেশী; যারা ছিল চরম নির্যাতিত-নিপীড়িত। যুদ্ধের বিধান আসার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কুফ্যারদের উপর একের পর এক ছোট-বড় আক্রমণ ও সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হতে লাগল গনীমাতের মালের বিশাল ভান্ডারের হাত ধরে ধনাঢ্যতা। কুফ্যারদের বিপর্যয়ের দরুন দলে দলে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক আর মুসলমানদের ইজ্জত, সম্মান, নিরাপত্তার পূর্ণমাত্রা এবং সবশেষে বৃহত্তর মক্কা বিজয় এবং মাত্র দশ বৎসরের মাথায় রসূল (সঃ) বিদায় হাজ্জ্ব গেলেন একলক্ষ চৌদ্দ হাজারেরও (১,১৪,০০০) বেশী সংগী নিয়ে। অত্যন্ত সংক্ষেপে এই হল চিত্র, এই হল জিহাদের বরকত, রহমত। রসূল (সঃ) এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশেদা জিহাদের ধারা অব্যাহত রেখে আল্লাহর ইচ্ছায় রোম-পারস্য সহ ইউরোপ-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ইসলামের তথা মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন, যা সবারই জানা। খুলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসকদের মাঝে অর্পুদ্বন্দ্ব, বিলাসিতা, সেচ্ছাচারিতা, যুলুম ইত্যাদির অনুপ্রবেশ অব্যাহত ভাবে বাড়তে থাকায় অনেক অঞ্চল মুসলিমদের হাতছাড়া হতে থাকে। তবে জিহাদের ধারা

প্রত্যেক শতকেই কম-বেশী অব্যাহত থাকায় কুফ্যার শক্তি মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি; যদিও মুসলমানদের বিজয় ধারা থেমে যায় এবং কুফ্যারদের জাগতিক উৎকর্ষের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে ও নিজেদের স্বকীয়তা ও আদর্শকে যথাযথভাবে লালন করতে না পেরে মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ পর্যায়ক্রমে কুফ্যারদের কৃষ্টি-কালচারের সাথে মিশে গিয়ে কার্যত: তাদের দাসত্ব বরণ করতে থাকে। এমনি অব্যাহত অধপতনের ধারায় উপস্থিত হয় সেই সময়, যে সময়ের মুসলিম জাতির অবস্থা রসূল (সঃ) চিত্রায়িত করেছিলেন এভাবে, “তোমাদের উপর কাফিররা একযোগে আক্রমণ করবে চারদিক থেকে, যেমনিভাবে লোভী পেটুকরা খাবারের পেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) কেন এমন হবে? আমরা কি সংখ্যায় কম হব? তিনি (সঃ) বললেন, না, বরং তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে সমুদ্রে ভাসমান খড়-কুটোর ন্যায়। তোমাদের ব্যাপারে শত্রুদের কোন ভয় থাকবে না আর তোমাদের ‘অহাব চেপে বসবে। প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)! অহান কি? তিনি (সঃ) বললেন, অহান হল দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা।” (আহমদ) কোন কোন বর্ণনায় ক্বিতালের স্থলে রয়েছে, মৃত্যুকে অপছন্দ করা; যার ভাবার্থ ও উদ্দেশ্য একই।

এমনি কঠিন প্রেক্ষাপটে করণীয় এবং সফলতা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীসগ্রন্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সনদে এসেছে, “আমার উম্মতের মধ্য হতে একটি তাইফা (দল) আল্লাহর আদেশের উপর কিয়ামত পর্যন্ত ক্বিতাল চালিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তারা বিজয়ী হবে, তাদের শেষ অংশটি ঈসা (আঃ)-এর সংগী হিসেবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে।” কোন বর্ণনায় ‘তাইফা’ শব্দটির স্থলে ‘ইসাবা’ এসেছে। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, উম্মাহর অবস্থান যাই হোক এই বিজয়ী দলের অস্তিত্ব থাকবেই। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ১১ই

সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার হামলার মধ্য দিয়ে উম্মাহর অন্যতম বীর সন্তানদের ১৯ জনের কুরবানীর মাধ্যমে নতুন শতক ও সহস্রাব্দের উন্মাদনেই যমীনের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে আত্মোৎসর্গ আর প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা-প্রতিযোগীতা। ইরাক-আফগান যুদ্ধ হয়ে উঠে যমীনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিহাদীদের জন্য বরকতময় ঝর্নারধারা কিংবা কয়েক বৎসরব্যাপী অব্যাহত খরার পর যেন প্রয়োজনীয় বৃষ্টির উৎসধারা; আলহামদুলিল্লাহ।

মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যেই ইরাক-আফগান, ইয়েমেন, সিরিয়া, পাকিস্তান, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া এসব অঞ্চলের মুজাহিদগণ এখন প্রতিশোধ-প্রতিরোধে শুধু নিজেদের ভূ-খন্ডেই নয় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ কাশ্মীর, ককেশাস, মিসর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডের জিহাদে এসেছে নতুন গতি ও সক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি। মালি, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো ও বাংলাদেশ সহ বেশকিছু ভূ-খন্ডে এসেছে উড়ন্ত সূচনা। সর্বোপরি, মহান আল্লাহর ওয়াদানুযায়ী কুফ্যাররা এখন ভীত-সন্ত্রস্ত, সংকুচিত। জিহাদী ভূ-খন্ড ক্রম বিস্তৃত, নির্যাতিত মুসলিম জনপদ পেয়েছে মুক্তির উপায়। বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় পরিসরে ইসলামী শাসনের বাস্তবায়নের ঘোষণায় গ্লোবাল খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এখন যেন আর স্বপ্ন নয় বরং নিকট বাস্তবতা, আলহামদুলিল্লাহ।

২০০১ হতে ২০১৫, জিহাদী ফিল্ডে এত বড় অর্জন যে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সমূহের বড় অংশ জুড়ে শুধু জিহাদ সংশ্লিষ্ট সংবাদ, প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ আর কুফ্যারদের নিত্য নতুন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ শুধুই জিহাদ নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু কোনই লাভ নেই। কারণ, জিহাদের ময়দানে ১৫ বৎসরে এই গতি অর্জিত হয়েছে অনেক বড় ত্যাগ আর কুরবানীর বিনিময়ে। যে ত্যাগ আর কুরবানীর মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বরেন্য ওস্তাদ, শেখ ও তাদের ছাত্র-শিষ্যগণ। যাদের বর্ণনা “একুশ শতকের সূচনা লগ্নে শহীদী কাফেলার সদস্যগণ” শিরোনামে ধারাবাহিক উপস্থাপনায় আসবে, ইন্শা আল্লাহ ॥



“আর কুফরী শক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে দিতে না পারে।” (সূরা আল-বাকারাহ : ২১৭)।

“আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন কেবল আল্লাহরই জন্য হয়ে যায় পূর্ণভাবে। (সূরা আনফাল : ৩৯)।

১. শত্রু যখন মুসলিমদের কোন ভূমি দখল করে, সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতে জিহাদ তখন ফরদুল আইন হয়ে যায়। ২. জিহাদ যখন ফরদুল আইন হয়ে যায় তখন জিহাদের মধ্যে ও সলাত-সিয়ামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তবে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এক্ষেত্রে সলাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মালিকী মাযহাবের কিতাব *ÔevMjvZzm mvwjK wjAvKivwej gvmvwjKÓ* এ এসেছে, “আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জিহাদ করা ফরদুল কিফায়াহ; যদি কিছু লোক তা আদায় করে তাহলে বাকীদের উপর থেকে ফরযের হুকুম উঠে যাবে। আর জিহাদ ফরদুল আইন হবে- যখন ইমাম তাকে ফরদুল আইন বলে ঘোষণা দিবেন। কোন অঞ্চলে শত্রু কর্তৃক আক্রমণ হবার পর- এমন পরিস্থিতিতে এই ফরদুল আইন হবে সলাত-সিয়ামের মতই, যা ত্যাগ করার কোনই সুযোগ নেই।

হানাফী মাযহাবের কিতাব মাজমাউল আনহারেও এটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই সাথে বলা হয়েছে, জিহাদ যদি ফরদুল কিফায়া থাকে কিন্তু সেই ফরযে কিফায়াটি যদি সকল মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে তা সলাতের মতই ফরযে আইন হয়ে যাবে।

৩. জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায় তখন পিতা-মাতার কাছ থেকে কোন অনুমতির প্রয়োজন থাকে না, যেমনভাবে সলাত ও সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। ৪. জিহাদ ফরযে আইন হলে ওযর ছাড়া জিহাদ ছেড়ে দেয়া এবং ওযর ছাড়া রমযানের সিয়াম ছেড়ে দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

৫. 'নফসের জিহাদ' হচ্ছে শয়তানের ওয়াস ওয়াসার উপর বিজয়ী হবার চেষ্টা, এটা মুমিনদের উপর ফরদুল আইন যা কুরআন ও সুন্নাহর তরীকানুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু নফসের জিহাদ কাউকে জান-মাল দ্বারা সশস্ত্র যুদ্ধ তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা কিতালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না। বরং কোন ব্যক্তি যখন নিজেকে ইসলাম, হিজরত ও জিহাদের ময়দানে নিয়ে আসতে পারে তখনই কেবল প্রমাণিত হবে যে, সে শয়তানের উপর নফসের জিহাদে বিজয়ী হয়েছে। এর প্রমাণ ঐ সহীহ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, "বনী আদমকে আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দানের জন্য শয়তান তার পথে বসে যায়। অতঃপর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হয়, শয়তান তখন তাকে বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বনী আদম শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং শয়তান হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর আসে হিজরতের পালা। এবার শয়তান ঐ মুসলিমকে বলে, তুমি তোমার ধন-সম্পদ, ভিটেমাটি, আত্মীয়-স্বজন ফেলে হিজরত করবে? এবারও সে হিজরত সম্পন্ন করে শয়তানকে হতাশ করে। এবার জিহাদের পালা। শয়তান বলে, দেখ, তুমি জিহাদে গেলে মারা পড়বে। অতঃপর তোমার স্ত্রীকে অন্য একজনে বিয়ে করবে, তোমার ধন-সম্পদ অন্যরা নিবে, তোমার সন্তানরা এতীম হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবারও ঐ বনী আদমের কাছে শয়তান পরাজিত হয়। সে সব ধরনের ওয়াসওয়াসার উপর বিজয়ী হয়ে জিহাদে লিপ্ত হয়। তাহলে বুঝা গেল একজন ব্যক্তি নফসের জিহাদে তখনই সফল প্রমাণিত হবে, যখন সে কিতালের ময়দানে সঠিক নিয়াত ও ইখলাছ সহ আসবে।

৬. নফসের জিহাদের মাধ্যমে জান-মাল রক্ষা করার চেষ্টা করলে কোন ফায়দা নেই তা যত বেশী পরিমাণেই হোক না কেন। সুতরাং প্রত্যেককেই নফসের জিহাদ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তথা কিতালের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে।

৭. নিশ্চয়ই বর্তমানে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা ফরদুল আইন। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর সকলেই পাপী অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের ভূ-খন্ডের সর্বশেষ অংশটি কুফরারদের হাত থেকে উদ্ধার না হয়। শুধুমাত্র মুজাহিদরাই এই পাপ থেকে রেহাই পাবে।

৮. আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা কখনোই কোন ব্যক্তির জিহাদ ছেড়ে দেয়ার ওজর গ্রহণ করবেন না, তবে কেবল তারা ব্যতীত যাদের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "৯:৯১-৯২; ৪:৯৭-৯৯; ৪৮:১৭ অর্থাৎ যারা পঙ্গু, অসুস্থ, চরম দুর্বল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, অক্ষম ইত্যাদি শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। এই শ্রেণী

অবশ্যই নিয়াত ও ইখলাছ যথাযথ করবে এবং জিহাদ ও মুজাহিদদের শক্তিশালী করে এমনসব কাজ কর্মে জড়িত থাকবে সাধ্যানুযায়ী। এরা ছাড়া কোন ডাক্তার, বড় কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক, আলিম এদের কেউই জিহাদ থেকে অব্যাহতি পাবে না; যখন জিহাদ ফরদুল আইন হয়। তবে জিহাদের ইমাম বা আমীর যদি কাউকে বিশেষ কোন দায়িত্বে রেখে যান তাহলে তা ভিন্ন বিষয়।

৯. বর্তমানে কুফরার গোষ্ঠী যেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে সে সব জায়গায় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করা অবশ্যই ফরদুল আইন।

১০. জিহাদ এবং ফী সাবিলিল্লাহ এ দু'টি শব্দ বা বাক্যাংশের শাব্দিক অর্থ যা-ই হোক না কেন একক ভাবে ব্যবহারের বেলায় এর দ্বারা কেবল সশস্ত্র যুদ্ধই বুঝাবে, যেমনটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে আল-কুরআন, রসূলের (সঃ) সুন্নাহ, সাহাবাগণের (রাঃ) আমল-বুঝ-ব্যাখ্যা ও সকল ইমামগণের বক্তব্য-ভাষ্য দ্বারা। সুতরাং মডারেট আলেমদের ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতারণিত হওয়া যাবে না।

১১. জিহাদ হচ্ছে জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত ফরয ইবাদত। সুতরাং এক বছর সিয়াম পালন করা আর অন্য বছর ছেড়ে দেয়া যেমন জায়েজ হবে না কিংবা একদিন সলাত আদায় করে অন্যদিন বিরত থাকা যেমন জায়েয হবে না, ঠিক তেমনি জায়েজ হবে না এক বছর জিহাদ করে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও অন্য বছর তা ছেড়ে দেয়া।

১২. "আমরা ছোট জিহাদ (কিতাল) থেকে বড় জিহাদের (নফসের জিহাদ) দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম" এই কথাটি হাদীস হিসেবে প্রচারিত হলেও মূলতঃ এটা হাদীসে রসূল (সঃ) নয়। আর এটা কুরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার পরিপন্থী।

১৩. নিশ্চয়ই রসূল (সঃ)-এর যুগে জিহাদ ছিল কয়েক প্রকারের। বদরের অংশগ্রহণ ছিল মুস্তাহাব, খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল ফরযে কিফায়া। কিন্তু খন্দক ও তাবুক যুদ্ধে ছিল ফরযে আইন। এভাবেই অন্যান্য গায়ওয়া ও সারিয়াগুলো বিভাজিত হবে। আবার সাহাবা ও তাবেরইনদের যুগে বেশির ভাগ সময়েই জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকত। কারণ, তখন বেশির ভাগ অভিযানই ছিল নতুন অঞ্চল জয় করার জন্য। কিন্তু বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

১৪. নিশ্চয়ই জিহাদ হচ্ছে একটি সামষ্টিক ইবাদত। প্রত্যেকটি জামাআহ বা জনসমষ্টিরই একজন আমীর আবশ্যিক। জিহাদের বেলায় আমীরের আনুগত্য সবচেয়ে বেশী জরুরী।

আমরা উক্ত আহকামগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের আলোচনা পরবর্তীতে করব, ইনশা আল্লাহ্।



বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির বলির পাঠা নিরীহ সাধারণ জনতা; স্ব-স্ব অবস্থান হতে শয়তানী শক্তিকে সর্বোপায়ে দুর্বল করার পলিসি বাস্তবায়নই এখন সময়ের দাবী।

“তোমরা সৎ, পুণ্য ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে একে অন্যকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না।” (সূরা মায়িদাহ : ২)।

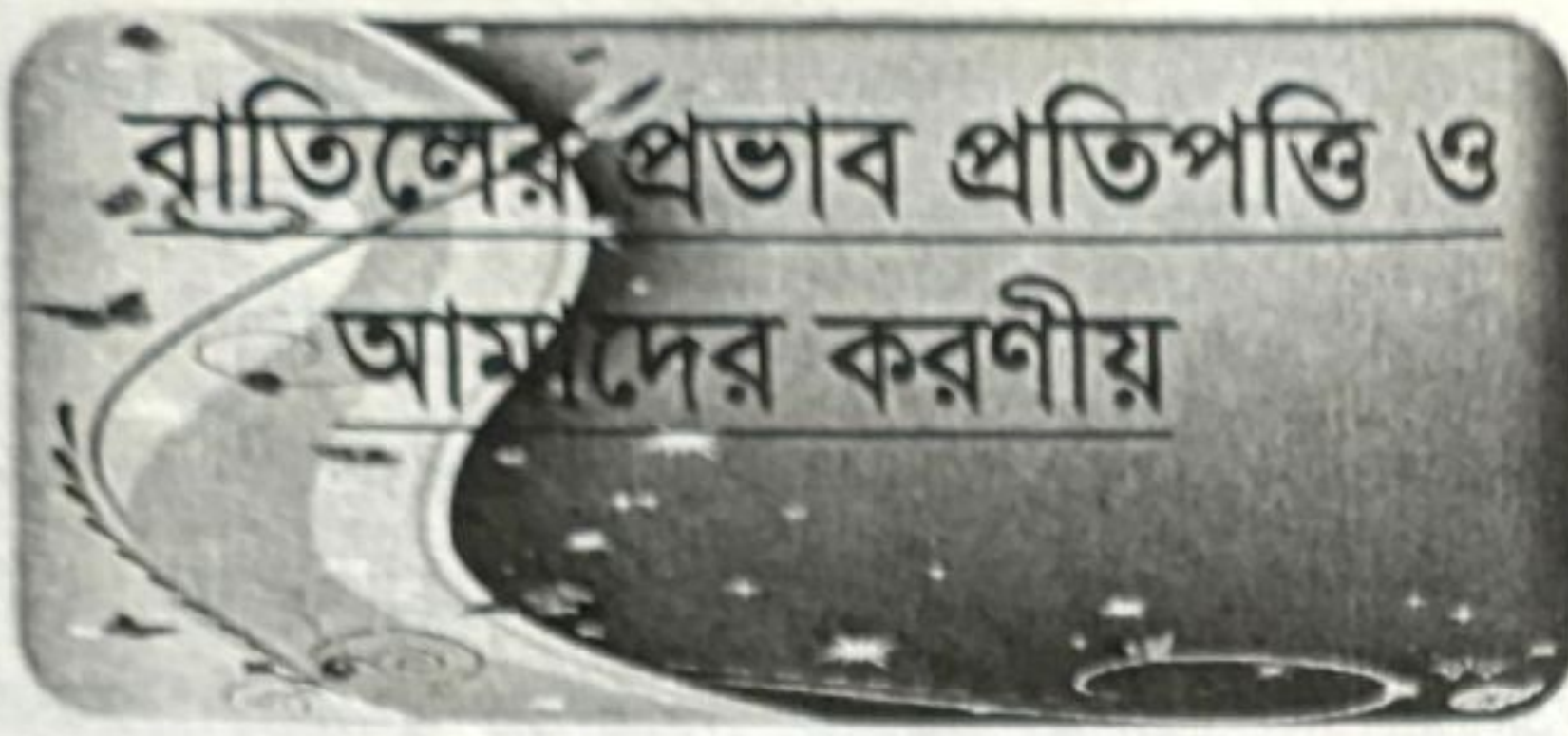
হে মানুষ! শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই শয়তান তার দল-বল তথা অনুসারীদের ডাকে, যেন তারা হয় জাহান্নামের অধিবাসী।” (সূরা ফাতির : ৬)।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিটি পর্বই কুফর, শিরক, যুলুম ও নিফাক্ব মিশ্রিত। তবে, শয়তান ও তার অনুসারীরা যেমন মাঝে মধ্যে কিছু ভাল কথা ভাল কাজ উপস্থাপন করে থাকে, গণতন্ত্রের ধারকরাও তেমনি নিজের ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে কিছু ভাল কাজে ভূমিকা রাখতে পারে- যা পরকালীন প্রতিদানের বেলায় নিষ্ফল। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে হরতাল, অবরোধ, মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদির নামে জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বন করে থাকে তখন সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ ক্ষতির শিকার হন সাধারণ জনতা। যাদের জান-মালের নিরাপত্তা তখন সম্পূর্ণ হুমকির মুখে পড়ে। আমরা যদি চলমান বর্ষের শুরু হতে চলা ২০ দলীয় জোটের অবরোধের উপর স্ট্যাডি করি তাহলে দেখতে পাই গরীব কৃষক, চাষী, দিনমজুর, শ্রমিক, পশু-পাখির খামারী, পরিবহন শ্রমিক এসব শ্রেণীর লোকজনই অবরোধ সংক্রান্ত ক্ষতির প্রথম শিকার। একইভাবে আগুনে দগ্ধ হওয়া ও নিহতদের মধ্যেও প্রায় সকলেই সাধারণ শ্রেণীর নাগরিক। কারণ,

ধনিক শ্রেণী এবং রাজনীতিবিদরা তো জনগণের ট্যাক্সের টাকায় শোষণ ও দুর্নীতির সুযোগ পেয়ে টাকার কুমির হয়েছেন এবং রাস্তা-ঘাটে চলাফেরার বেলায় স্পেশাল প্রটেকশন পাচ্ছেন। আজকে যদি বি.এন.পি-র স্থলে আওয়ামীলীগ বিরোধীদল হত তাহলে তারাও একই অবস্থা কিংবা আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির অবতারণা করত। যেমনটি আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে আওয়ামীলীগের ডাকা হরতাল-অবরোধের দিনগুলির উপর স্ট্যাডি করে। সুতরাং সাধারণ জনতাকে বলির পাঠা হওয়া থেকে বেঁচে থাকার কোন একটা উপায় অবশ্যই বের করতে হবে।

আমরা প্রথমেই পরকালীন প্রতিদান, পরিণামের উপর লক্ষ্য রেখে সকলের উদ্দেশ্যে বলব, গণতান্ত্রিক কোন কর্মসূচী তথা মিছিল-মিটিং, বিক্ষোভ-সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণা, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা ভোট প্রদান ইত্যাদির কোন পর্বই আপনারা অংশগ্রহণ করবেন না। অন্যথায় এ ধরনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কুফরী ও অপরাধীদের সহযোগীতার অপরাধে আপনি আল্লাহর নিকট অভিযুক্ত হবেন। আর আপনার ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তির পাপাচারে আপনার অংশ থাকবে; অতএব সাবধান! এছাড়া গণতান্ত্রিক কোন কর্মসূচীতে আপনার অংশগ্রহণ না করাই হবে আপনার সামর্থ্যের মধ্য হতে শয়তানী শক্তিকে দুর্বল করার প্রথম পদক্ষেপ। কখনোই এটা মনে করবেন না যে, আমি একা অংশগ্রহণ না করে আর কী করব? সাবধান! আল্লাহর নিকট আপনাকে আগে দায়মুক্ত করুন, এরপর অন্যকে উক্ত অংশগ্রহণ না করার ফায়দা তুলে ধরে উৎসাহিত করুন এবং অংশগ্রহণ করার পরিণাম তুলে ধরে সতর্ক করুন। মনে রাখবেন, ‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল; গড়ে তোলে মহাদেশ সমুদ্র অতল’ এটাই বাস্তবতা। সুতরাং আপনার একা অবস্থান থেকেই বড় দল গড়ে উঠবে, ইনশা আল্লাহ।

গণতান্ত্রিক সরকারকে নিত্যনতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবন করার মাধ্যমে যথাসম্ভব চেষ্টা করে যান খাজনা, ট্যাক্স, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কর না দিতে। যে পরিমাণ কর আপনি দিতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা গণতান্ত্রিক শক্তি দরুন আপনি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যে ক্ষতির শিকার হয়েছেন বা হচ্ছেন তা কিছুটা হলেও উসূল করতে ॥



“যমীনের বুকে কাফিরদের অবাধ বিচরণ ও প্রভাব প্রতিপত্তি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। এটা তো সামান্য ভোগ মাত্র; অতঃপর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট ঐ আশ্রয়স্থল।” (সূরা আল-ইমরান : ১৯৬-১৯৭)।

“আর কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি নিজেদের কল্যাণের জন্য। নিশ্চয়ই আমি তাদের অবকাশ দেই পাপ বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক, অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষমান।” (সূরা আল-ইমরান : ১৭৪)।

হক্কের উপর বাতিলের প্রভাব-প্রতিপত্তি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী একটা অবস্থামাত্র; যে ক্ষণস্থায়িত্ব এবং ঐ অবস্থার দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে, “সমুদ্রের পানির উপরে পাহাড়সম উচু ফেনা যা কিছু সময়ের জন্য ফুলে উঠে, ঠিক একই ভাবে ফেনা উপরে উঠে আসে যখন অলংকারাদি তৈরীর উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ইত্যাদি উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর সাময়িক পরই বাতাসের সাথে ফেনা উড়ে যায় এবং উপকারী জিনিসই যমীনে রয়ে যায়। এভাবেই আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হক্ক ও বাতিলের।” (সূরা রাদ : ১৭)। তাহলে বুঝা গেল সমুদ্রের ঐ ক্ষণস্থায়ী ফেনা তুল্য হচ্ছে বাতিলের প্রভাব-প্রতিপত্তি, যা সাময়িক পরেই উড়ে যেতে বাধ্য এবং সমুদ্রের পানি তুল্য হক্কই যমীনে বিদ্যমান থাকবে।

এখন প্রশ্ন হল, বাতিলকে সাময়িক সময়ের জন্য প্রভাব বিস্তারের এই সুযোগ আল্লাহ্ তা'য়ালা কেন দিয়ে থাকেন? এর উত্তর হল :

১. হক্ককে হক্ক হিসেবে যমীনবাসীর জন্য যথাযথ প্রতিপন্ন করতে এটা একটা চিরন্তন পদ্ধতি।

২. বাতিলের অনুসারীদের ভাল কর্মসমূহের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়ার জন্য। কেননা পরকালীন জীবনে তাদের জন্য কেবলই শাস্তি আর শাস্তি।

৩. বাতিলের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য।

৪. বাতিলের চূড়ান্ত উন্নতি মানেই নিশ্চিত পতন আসন্ন। সুতরাং এটা বাতিলের পতন ঘণ্টা।

৫. এর মাধ্যমে ঈমানদারগণের আনুগত্য পরীক্ষা করা হয় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পাপবৃদ্ধি করা হয়।

তাই বাতিলের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে কখনোই আফসোস করা যাবে না এ মর্মে যে, আমি যদি তার মত হতাম! কিংবা আমাকেও যদি তার মত সহায়-সম্পদ দেয়া হত, ইত্যাদি। পবিত্র কিতাবে নবী (সঃ) কে নির্দেশ দানের মাধ্যমে তাঁর উম্মাতকে শেখানো হচ্ছে : “আমি কাফিরদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো (কামনার দৃষ্টিতে) চক্ষু প্রসারিত করো না; আমি তো এর দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই।” (সূরা হিজর : ৮৮, ত্ব-হা : ১৩১)।

একই উপদেশ রয়েছে কারুনের দৃষ্টান্তে, যেখানে দেখা যায়, কারুনকে এত সম্পদ দেয়া হয়েছিল যে, তার কোষাগারের চাবিগুলো বহন করার জন্যই নিযুক্ত ছিল শক্তিশালী একদল লোক, খচ্চর বা গাধা। কারুনের এত সম্পদ দেখে কিছু দুনিয়াদার ব্যক্তি আফসোস করতে লাগল এভাবে যে, হায় আফসোস! কারুনের মত যদি আমাদেরকেও দেয়া হত। প্রকৃতই কারুন মহা ভাগ্যবান! এর উত্তরে যাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল : ধিক তোমাদেরকে! কেন তোমরা এমন আফসোস করছ, এমন কামনা করছ? যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্ পুরস্কার শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীলরা ছাড়া আর কেউ এটা পাবে না।

অতঃপর কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হল। তার পক্ষে কোন দল ছিল না যে, আল্লাহ্ শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

এবার পূর্বের দিন যারা কারুনের মত ধনী হবার আকাংখা করছিল, আফসোস করছিল তাদের হুশ ফিরে এল। তারা বলতে লাগল : দেখলে তো! আল্লাহ্ই যার জন্য ইচ্ছা রিয়ক বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা কমিয়ে দেন। আল্লাহ্ রহমত না থাকলে আমরাও আজ কারুনের সাথেই ভূ-গর্ভে প্রোথিত হয়ে যেতাম। দেখলে তো! কাফিররা সফল কাম হয় না। (সূরা কাসাস : ৭৬-৮৩)। (অধিকতর আলোচনা পরবর্তী কোন সংখ্যায়, ইনশা আল্লাহ্)॥



মূল : শায়খ আবু মুসআব আস সুরী

অনুবাদ : আত তাওহীদ মিডিয়া গ্রুপ, সূত্র :
দামুইয়া

“তুমি সতর্ক কর তাদেরকে যে বা যারা কুরআনের অনুসরণ করে এবং না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে। তাকে সুসংবাদ দাও ক্ষমার ও এবং সম্মানজনক পুরস্কারের।” (সূরা ইয়াসীন : ১১)।

“মানুষকে সতর্ক কর অত্যাশন্ন কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যখন বিপদের ভারে প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হবে। যালিমদের জন্য কোন প্রকার শুভাকাংখী, বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না।” (সূরা মুমিন : ১৮)।

১. নিয়্যাত, ইখলাছ ও হিসাব-নিকাশ সর্বদা ঠিক রাখতে হবে এবং সলাত ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান!

২. মুজাহিদদের অন্তর ও মনের মধ্যে জিহাদের আকীদা ও এর সার্বিক দিক সমূহের বীজ বপন করার ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলা করা থেকে সাবধান!

৩. শরীয়াহ ও চারিত্রিক আখলাক সংক্রান্ত বিশেষ বিষয় সমূহে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করা থেকে সাবধান!

৪. অন্যায়ভাবে মুসলিমদেরকে তাকফীর করা থেকে সাবধান! বিশেষ করে তাকফীরে মুয়াইয়ীন তথা নির্দিষ্ট কাউকে তাকফীর করার জন্য ব্যস্ত হওয়া থেকে সাবধান!

৫. অস্ত্র-বল্লমের যুদ্ধের পরিধি এবং যুক্তি-বক্তৃতার পরিধিকে এক করে ফেলা থেকে সাবধান!

৬. রাজ দরবারের আলেম এবং সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ছাড়া জাগরণ আন্দোলনে লিপ্ত বিভ্রান্ত নেতাদের কাছে আসা-যাওয়া থেকে সাবধান!

৭. কাফির-মুরতাদদেরকে হত্যার সময় মুসলিমদের রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে সাবধান! এবং সব ধরনের সীমালংগণ হতেও সাবধান!

৮. জিহাদের আহকাম ও শত্রু বা বন্ধুর সাথে প্রয়োগ নির্দেশায়িত ইসলামের আদব ও আখলাক সমূহের ব্যাপারে অবহেলা থেকে সাবধান!

৯. আমাদের মুসলিম জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মুজাহিদদের দ্বারা এমন কিছু হওয়া থেকে সাবধান!

১০. দাওয়াতী কাজের সুবিধার নামে বা জিহাদের সুবিধার নামে ত্বাগুত ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে সাবধান!

১১. যতক্ষণ না আমেরিকার সামরিক শক্তি বিশেষতঃ তাদের বিমান তথা আকাশ পথে আক্রমণের শক্তি পূর্ণমাত্রায় দুর্বল না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ কোন ছোট অঞ্চলে উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাবধান! তবে নিরুপায় হলে ভিন্ন কথা।

১২. মুঠোফোন, টেলিফোন, ইন্টারনেট সহ সবধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের বেলায় নিরাপত্তার দিকগুলোতে অবহেলার ব্যাপারে সাবধান!

১৩. গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া এবং প্রচার করার প্রবণতার ব্যাপারে সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

১৪. কিতালের ফরজিয়াত ত্যাগ করা এবং এ ব্যাপারে শুধু তাহরীছ (উৎসাহ) করার মাধ্যমে নিজেকে ধোঁকা দেয়া থেকে সাবধান! তাহরীছ করুন এবং নিজে আমল করুন।

১৫. মুসলিমদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বা বিবাদে জড়িয়ে পড়া থেকে সাবধান!

১৬. আমাদের দায়িত্ব হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা; নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় হল ‘তাকওয়া’। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা আমাদের দায়িত্ব, আশ্রয় কেবল তারই নিকট। আমরা আল্লাহর যিকর হতে গাফিল না হই, কারণ এটা হল রক্ষাকারী ঢাল এবং আল্লাহর সান্নিধ্যের মাধ্যম। আর দুআ একটি কার্যকর অস্ত্র, এই অস্ত্রের ব্যাপারে আমরা যেন ভুলে না যাই। জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোন অবস্থা নেই। তিনি যা চান তা-ই হয়। তিনি ছাড়া কোন শক্তি নেই। তিনিই আল্লাহ সুউচ্চ, সুমহান ॥

পাঠকের জিজ্ঞাসা ও জবাব



প্রশ্ন : জিহাদবিমুখ কারা? তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার পরিণাম কী?

উত্তর : সাবধান! জিহাদ বিমুখ দা'য়ীদের ফাঁদে পা দিবেন না, অন্যথায়, পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত!

“আল্লাহ ও আখিরাতে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিগণ তাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি চাইবে না; আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবই জানেন। নিশ্চয়ই অব্যাহতি তারাই চায় যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না এবং যাদের অন্তর (ঈমান আনার পরও) সন্দেহ-সংশয়যুক্ত থাকে (আল্লাহর ওয়াদা, বিজয় দানের অঙ্গীকার, জিহাদ-শাহাদাতের প্রতিদান ইত্যাদি সম্পর্কে)।” (সূরা আত-তাওবাহ : ৪৪-৪৫)।

বর্তমান পৃথিবীতে বা আমাদের চারপাশেই অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেখা যায় একাকী ভাবে বা সিভিকিট তৈরী করে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে, বই-পুস্তক, লিফলেট প্রকাশ করে, মসজিদে-মাহফিলে বয়ান করে নিজেকে বা নিজেদেরকে ইসলামের অনেক বড় দা'য়ী হিসেবে উপস্থাপন করে জনগণের একটা বড় অংশের ভক্তি-শ্রদ্ধা, অর্থ ইত্যাদি হাতিয়ে নিচ্ছেন। এদেরকে যখন দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ-কিতালের দিকে আহ্বান করা হয় বা কিতালের বিষয়ে বলা হয় তখন যে ধরনের উত্তর আসে তা হলোঃ

“কেউ কেউ বলেন : আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান যে দাওয়াতী কাজ করছি এর মাধ্যমেই হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান-ইহুদী এদের সবার নিকট ইসলামকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করে ইসলামকে শ্রে'প্রমাণ করে যাব সবাই ঈমান আনবে।”

“কেউ বলেন : আমরা কথা-কলমের জিহাদ করে যাচ্ছি। এটাই এখন জিহাদ, অস্ত্রের যুগ এখন প্রয়োজন নেই।”

‘কেউ বলেন : ভাই যুদ্ধ করব, তবে দাওয়াতী কাজের অনেক বাকী আছে। এখনই ফিল্ড নষ্ট করতে চাই না।’

‘কেউ বলেন : আমরা তো ইলম চর্চা করছি, ইলম বিতরণ করছি; এটাই আমাদের জিহাদ।’

‘কেউ বলেন : ভাই দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করে আমাদেরকে কৃষি, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের নকশা তৈরী করে কাজ করতে হবে। একটা বিপ্লবের পরে শেষ মূর্ত্ততে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলে আমরাও ডিজিটাল যুদ্ধ করব।’

‘কেউ বলেন : আরে ভাই, এত বড় বড় পরাশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন, আপনার কী আছে? পাহাড়ে আর জঙ্গলে থেকে বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে কী দিয়ে লড়বেন? এটা তো যুদ্ধ নয় বরং আত্মহত্যা।’

‘কেউ বলেন : আরে ভাই জিহাদীদের আকীদা ঠিক নেই, সুতরাং আমরা আগে মানুষকে আকীদা ঠিক করার কাজ করে যাচ্ছি।’

‘আর কেউ কেউ তো তুণ্ড শাসকদের মুসলিম আখ্যা দিয়ে চুক্তির অজুহাতে অন্যান্য আসলী কাফির-মুশরিকদের সাথেও এ মূর্ত্ততে জিহাদ চলবে না মর্মে ফতোয়া দিয়ে উল্টো মুজাহিদদেরকেই খারিজী, ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, শান্তি বিনষ্টকারী বলে প্রচার করে বিভিন্ন দেশের সরকারকে উত্তেজিত করে থাকেন, যাতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয়।’

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়ে এদের প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য তুলে ধরবঃ এতে করে পাঠকগণ দেখতে পাবেন এদের উপরোক্ত উক্তিসমূহ নতুন নয় বরং এ ধরনের লোকগুলো পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল এবং আজও আছে। এদের প্রকৃত চেহারা পবিত্র কুরআনে উন্মোচন করা হয়েছে। এ সকল উক্তি সমূহের নিন্দা এবং এদের সম্পর্কে এসেছে সতর্কবাণী। এসব তুলে ধরার আগে এদের মূল পরিচয় আমরা দেখব;

১. এদের প্রথম পরিচয় হল, এরা বা এদের অধিকাংশই ঐ সকল আলেমদের উত্তরসূরী যারা পার্থিব স্বার্থের কারণে সত্য গোপন করে আসছে। যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য এসেছে : “নিশ্চয়ই আমি যেসব পথনির্দেশ ও নিদর্শন নাযিল করেছি, এই কিতাবে (আল-কুরআনে) সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে লানত দেন এবং লানতকারীগণও (জীব-জন্তুও) তাদেরকে লানত দেয়। তবে যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে দেয়, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।” (সূরা আল-বাকারাহ : ১৫৯-১৬০)।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা যারা গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে সামান্য মূল্য (পার্থিব যে কোন স্বার্থ) গ্রহণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের পেট জলন্ত অঙ্গার দ্বারা পূর্ণ করে থাকে; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কেননা তারা হেদায়েতের বিনিময় করেছে গোমরাহী দ্বারা

এবং ক্ষমার বিনিময়ে নিয়েছে আযাব।” (সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৪-১৭৫)।

“আর তুমি তাদেরকে শোনাও ঐ ব্যক্তির সংবাদ যাকে আমি আমার আয়াত দিয়েছিলাম (কিতাবের জ্ঞান), কিন্তু সে উহা ছেড়ে দিল; সুতরাং শয়তান তার পেছনে লাগল, এবং সে হল বিপথগামীদের অর্ন্তভূক্ত। আমি চেয়েছিলাম তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে, কিন্তু সে যমীনের দিকে (পার্শ্ব স্বার্থের দিকে) ঝুঁকে পড়ল এবং নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করতে লাগল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হল কুকুরের ন্যায়; যদি কুকুরকে এমনি এমনি ছেড়ে দাও তবুও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, অথবা বোঝা চাপিয়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। এটাই হল দৃষ্টান্ত যে ক্বওম আমার আয়াত প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য। সুতরাং ঐ বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।” (সূরা আল-আরাফ : ১৭৫-১৭৬)।

“বনী ইসরাঈলদের হতে তাদের আলেমদের হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল; তারা যেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করে, সত্যকে গোপন না করে, পার্শ্ব কোন স্বার্থে আল্লাহর কিতাবকে, আয়াতকে ভিন্ন দিকে পরিবর্তন না করে। কিন্তু, তারা তাই করতে লাগল” ---- (সূরা আল-বাকারাহ : ৪২, আল-ইমরান : ১৮৭, আরাফ : ১৬৯)।

এছাড়া অন্যান্য সূরাতেও উক্ত আলেমদের ঘৃণ্য কর্মের তথা সত্য গোপনের সমালোচনা, নিন্দা ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। আমাদের বর্তমান সময়ের আলেমদের বড় একটি অংশ ঐ দিকেই গিয়েছে। ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে ইজ্জত, সম্মান, নেতৃত্ব, রহমত এর কোনটাই তাদের কাছে আসছে না। এছাড়া এরা তো ইলম অর্জন করেছে কেবল চাকুরী করার জন্য বা পাশ করার জন্য; তাহলে এদের দ্বারা আর কী-ই বা আশা করা যায়। প্রকৃত আলেমদের অবস্থানে এদের অল্প সংখ্যকই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সুতরাং সাবধান! একাডেমিক সার্টিফিকেট আর উপাধি বা লেবেল দেখে নয় আমলের উপর আলেমদের যাচাই করুন।

২. ঐ সকল আলেম বা দা'য়ীদের দ্বিতীয় পরিচয় হলো, এরা 'কিতাল ভীতি' নামক মারাত্মক ঈমান বিধ্বংসী ব্যাধিতে আক্রান্ত গোষ্ঠীর অনুসারী; পবিত্র কুরআনের শতাধিক আয়াত জুড়ে যাদের বর্ণনা রয়েছে। (আল্লাহর সাহায্যে পরবর্তী সংখ্যায় উপস্থাপিত হবে) ॥

প্রশ্ন : সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ বর্জন করার পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তরঃ “আর তুমি তাদের মধ্যে এমন লোক অনেক পাবে, যারা পাপ, সীমালংঘন ও হারাম (সুদ-ঘুষ) ভক্ষণে তৎপর, তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড অবশ্যই নিকৃষ্ট। কিন্তু

আল্লাহ ওয়ালাগণ এবং আলিমগণ ঐ সব লোকদেরকে পাপের কথায় এবং হারাম ভক্ষণে কেন বাঁধা দেয় না? (বাঁধা না দিয়ে চুপ থাকার) এ ভূমিকাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট।” (সূরা মায়িদা : ৬২-৬৩)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলিম ও ফকীর দরবেশদের ধর্মকের জন্য এর চেয়ে বেশী কঠিন আয়াত কুরআনুল কারীমে আর একটিও নেই। একদা হযরত আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেন : “হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎকার্যে লিপ্ত থাকতো এবং তাদের আলেমরা ও আল্লাহ ওয়ালারা সম্পূর্ণরূপে চুপ থাকতো। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হলো তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখো যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাঁধা প্রদানে তোমাদের না রিয়ক বা খাদ্য কমাবে, না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। (ইবনে কাসীর)

আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহতে এসেছে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন : আমি নবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি- “যে ক্বওমের মধ্যে কোন লোক আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ ক্বওমের লোকগুলো বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত না করে, তাহলে আল্লাহ সবার উপরই তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।”

“মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, রসূল (সঃ) সবার উপরই তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।”

“মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, রসূল (সঃ) বলেন, “বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যখন পাপাচারের প্রসার শুরু হয় তখন তাদের আলেমরা তাদেরকে বাঁধা দেয়। কিন্তু যখন দেখে যে, পাপাচারীরা তাদের কথা মানলো না তখন তারা তাদেরকে পৃথক না করে তাদের সাথেই উঠাবসা, পানাহার করতে থাকে। আল্লাহ তখন একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা সৃষ্টি করে দেন এবং হযরত দাউদ ও ইসা (আঃ)এর বদ দু'আর মাধ্যমে তাদের উপর লানত বর্ষণ করেন। কেননা, তারা অবাধ্য ও অত্যাচারী ছিল।, এটা বর্ণনা করার সময় নবী (সঃ) বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু একথা বলার পর সোজা হয়ে বসলেন : “না, না আল্লাহর কসম! তোমাদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমরা জনগণকে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বাঁধা দিবে এবং তাদেরকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়ে নেবে।”

সুনানে আবু দাউদ, তিরমীযি ও সুনানে ইবনে মাজাতে রয়েছে, রসূল (সঃ) বলেন, ‘বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বদাভ্যাস ঢুকেছিল যে, কোন লোক অপর কোন লোককে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখলে তাকে বাঁধা প্রদান করতো। তাকে সে বলতো : আল্লাহকে ভয় করা এবং খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর, এটা হারাম। কিন্তু পরদিন যখন সে তা ছাড়তো না তখন সে তার থেকে পৃথক হয়ে যেতো না। বরং একই সাথে পানাহার করতো এবং উঠাবসা করতো। এ কারণে সবার অন্তরেই সংকীর্ণতা এসে যায়।’ এরপর তিনি সূরা মায়েদার এ আয়াত পাঠ করেন,

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর লানত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লানত এ কারণে করা হয়েছিল, তারা আদেশের বিরোধীতা করেছিল এবং সীমালংগণ করেছিল। তারা একে অন্যকে অন্যায় কাজে বাঁধা দিত না; তাদের এমন ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।” (সূরা মাযিদা : ৭৮-৭৯)।

এরপর তিনি (সঃ) বলেন : “আল্লাহর শপথ! তোমাদের উপর ফরজ হচ্ছে এই যে, তোমরা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে এবং তাকে হকের উপর আসতে বাধ্য করবে।” আবু দাউদের হাদীসে অতিরিক্ত আছে, তোমরা যদি এটা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের অন্তরও একে অপরের সাথে মেরে দিবেন এবং তোমাদের উপর তার শাস্তি নাযিল করবেন, যেমন এদের উপর (বনী ইসরাঈলের) অবতীর্ণ করেছেন। মুসনাদে আহমাদ ও তিরমীযিতে এসেছে, নবী (সঃ) বলেন, “হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাঁধা দিতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর নিজ হতে শাস্তি পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দু’আ করতে থাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের দু’আ কবুল করবেন না।”

ইবন মাজাতে এসেছে, নবী (সঃ) বলেন : “তোমরা ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাঁধা দিতে থাক এমন সময় আসার পূর্বে যে, তোমরা দু’আ করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না।”

ইমাম বুখারী সংশ্লিষ্ট পর্বে রসূল (সঃ) এর ভাষ্য তুলে ধরেন তাতে অন্যায়কারী এবং যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যায় বাঁধা দেয় না এ উভয় দলের পরিণামের দৃষ্টান্ত হল, ঐ ডুবে যাওয়া জাহাজের দু’দল যাত্রীর ন্যায়, যাদের একদল ছিল জাহাজের উপর তলায় এবং অন্যদল ছিল নীচের তলায়। নীচের তলা চারদিক হতে আবদ্ধ থাকায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় পানি আনতে উপরে যেতে হয়। এমতাবস্থায়, উপর তলার যাত্রীদের বিরক্তি ইত্যাদি

সমস্যা দূরীকরণে নীচ তলার যাত্রীরা সরাসরি পানি তুলতে জাহাজের তলায় গর্ত করতে লাগল; কিন্তু উপর তলার যাত্রীরা বাঁধা দিল না। অতঃপর দু’দল যাত্রীই ডুবে মারা গেল।

এবার আমরা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে দৃষ্টি দিব, যেখানে বলা হচ্ছে : “এবং যখন জনপদের একটি অংশ বলল, “(হে অন্যায় বাঁধাদানকারীরা)! তোমরা কেন ঐ কওমকে অন্যায় বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করছ? আল্লাহই তো তাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন। তারা (অন্যায় বাঁধা দানকারীরা) বলল, ‘এটা আমাদের দায়িত্ব, সুতরাং আল্লাহর নিকট দায়মুক্তির জন্য এবং তাদেরকে (অন্যায়কারীদের) সাবধান করার জন্য। অতঃপর যখন তারা উপদেশ ভুলে গেল, আমি কেবল তাদেরকেই উদ্ধার করলাম যারা অন্যায় বাঁধা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যদের তথা যালিমদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, কারণ তারা ছিল পাপাচারী।’” (সূরা আরাফ : ১৬৪-১৬৫)।

এটা ছিল বনী ইসরাঈলের আসহাবুস সাবত তথা শনিবারের বিষয়ে সীমালংঘনকারীদের সময়ের ঘটনা। উক্ত ঘটনায় ৩টি দল হয়েছিল। তন্মধ্যে, প্রথম দলতো ছিল অন্যায়কারী দল। দ্বিতীয় দল অন্যায় বাঁধা দানে সচেতন ছিল। আর তৃতীয় দল অন্যায়কারী ছিল না বটে, কিন্তু অন্যায় বাঁধা দানে যারা সচেতন ছিল তাদেরকে বলতো ওদেরকে ওদের উপর ছেড়ে দাও। ওদের নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, ওদের বিষয় আল্লাহ দেখবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ শুধুমাত্র অন্যায় বাঁধা দানকারী দলকে রক্ষা করেছিলেন এবং বাকী দু’টি দলকে কঠিন শাস্তি দিলেন, তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করলেন। সূরা হুদের ১১৬ নং আয়াতের ভাষ্যে এসেছে, তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোতে কেন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকজন অন্যায় কাজে, যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে বাঁধা দেয় নি? তবে অল্প সংখ্যক ছিল যারা অন্যায় বাঁধা দিত। আমি তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছিলাম।’ (সূরা হুদ : ১১৬)।

সুতরাং এটা পরিষ্কার হল, আমাদের নিজেদের বাঁচার জন্যই অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রশ্ন হল : অন্যায় কাজে বাঁধা দানের পদ্ধতি কেমন হবে? কতক্ষণ পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে যেতে হবে এবং এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কিনা? (আমরা পরবর্তী সংখ্যায় এ সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরব, ইনশা আল্লাহ ৥)

দায়িত্ববোধের স্মরণ



মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের অনিবার্য করণীয় বিষয়াবলী

“আর তারা খাদ্য দান করে মহব্বতের সাথে; মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে খাবার দিলাম কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায়। তোমাদের নিকট চাই না কোন প্রতিদান বা বিনিময়।” (সূরা আদ-দাহর : ৮-১০)।

“নবী (সঃ) বলেন, তোমরা বন্দীদের মুক্ত কর।” (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ)।

প্রতি পক্ষের হাতে বন্দী হওয়া যে কোন মতাদর্শের রাজনীতিবিদদের জন্যই স্বাভাবিকতার অংশবিশেষ। তাই বলা হয়ে থাকে, “জেল-যুলুম-নির্যাতন, আন্দোলনের প্রশিক্ষণ।” ইসলামী রাজনীতি যার প্রধান অংশই হল জিহাদ। এ ময়দানের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের বন্দী হওয়া নতুন কিছু নয় বরং এর রয়েছে অনেক বিস্তৃত অতীত। কোন ভূ-খন্ডের একটি জিহাদী সংগঠন তার কর্মসূচী নিয়ে সামনে আসবে প্রতিপক্ষ তুণ্ডত প্রশাসন তার দমন-পীড়ন অবশ্যই বাড়াবে এটা চিরন্তন সত্যেরই অংশমাত্র। তবে, যে সকল ভূ-খন্ডে জিহাদ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে অর্থাৎ মুজাহিদগণ তামকীন পেয়েছেন, সেখানে স্বতন্ত্র ভূ-খন্ড কেন্দ্রিক নিজের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকায় বন্দী হওয়া, বন্দী মুক্তি ইত্যাদির প্রক্রিয়াটা একটু ভিন্ন ধরনের। বিপরীতে যেখানে জিহাদ কেবল মাত্র বীজ রোপনের অথবা চারা গাছ পর্যায়ে রয়েছে সেখানে প্রক্রিয়াটা অনেকটা সংশ্লিষ্ট দেশের অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বন্দী ও মুক্তি পাওয়ার প্রক্রিয়ার মতই হয়ে থাকে। আমরা পার্থক্য করছি, প্রতিপক্ষের আচরণ ও আইন প্রয়োগের ধরণগত পার্থক্য থেকে। সুতরাং আজকের নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, পাকিস্তান, লিবিয়া, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশসমূহে জিহাদ ইতিমধ্যে শক্তিশালী অবস্থানে বিধায়, ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে বা ক্র্যাক ডাউন দিয়ে একে একে বন্দী করার দিন ঐ অঞ্চলগুলোতে শেষ হয়ে গেছে। এখন সেখানে হেভী ফাইটিংয়ের মাধ্যমে দুপক্ষেই নিয়মিত হতাহতের ঘটনা ঘটে, উভয় পক্ষই একে অন্যকে বন্দী করার সুযোগ পায় এবং মুজাহিদরা তাদের বন্দী

মুক্তির জন্য বন্দী বিনিময়, জিম্মী বিনিময় এবং নিয়মিত বিরতীতেই কারাগারগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারছে, আলহামদুলিল্লাহ। অন্যদিকে, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, সৌদি আরব, ইত্যাদি দেশসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের। এ ধরনের পরিস্থিতিই জিহাদ এখনও প্রতিষ্ঠা পায় নি এমনসব অন্যান্য সকল দেশের চিত্র; যে দেশগুলোতে প্রচুর সংখ্যায় জিহাদমনা বা জিহাদ সমর্থক ভাই-বোন কারাবন্দী রয়েছেন। আমরা ইনশা আল্লাহ দেশভিত্তিক বন্দী সংখ্যা পরবর্তী কোন সংখ্যার সাময়িকীতে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। জিহাদের সমর্থনে ও তুণ্ডতের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই কেবল কারাবন্দী রয়েছেন অনেক বরেন্য আলেমে দ্বীন, সম্মানিত ওস্তাদ, শায়খ-মাশায়খগণের উল্লেখ করার মত অংশ। আমরা তাদের সম্পর্কেও পরবর্তীতে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

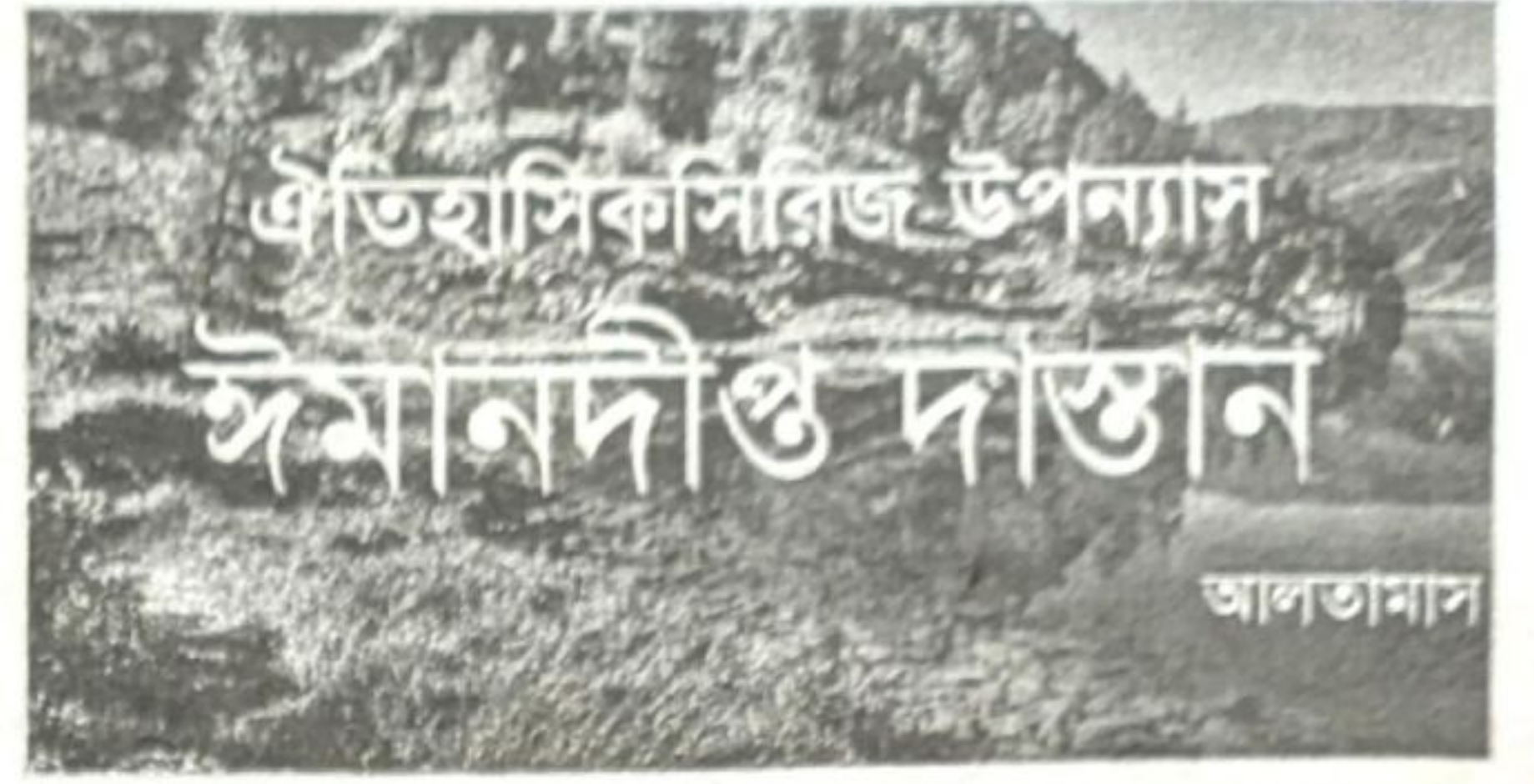
সুতরাং বন্দীগণ জিহাদেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ, তাদের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, প্রথম পর্যায়ের বন্দী ও শহীদগণের ত্যাগের উপরই একটি দেশের জিহাদী আন্দোলনের ফাউন্ডেশন মজবুত হয়ে থাকে, এটা চিরন্তন সত্যের মতই হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যা মুমিনদের স্বাক্ষীর উপর ভিত্তি করে বলছি, বাংলাদেশের গুটি কয়েক যুবক বন্দীদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ববোধ ভুলে গিয়ে, নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ রক্ষা ও উক্ত দায়িত্ব হতে অব্যাহতির গোপন ও শয়তানী বাসনা নিয়ে বন্দী মুসলিম-মুজাহিদদের সম্পর্কে নানান অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল এবং সীমিত পরিসরে এখনও ঐ অপপ্রচার চালিয়ে থাকতে পারে। উক্ত অপপ্রচারের মধ্যে রয়েছে- ১. বন্দীরা তুণ্ডতের সাথে হাত মিলিয়েছে। ২. বন্দীদের মধ্যে জং ধরেছে। ৩. বন্দীদের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি বলে তারা এই মর্মে অব্যাহতি নিতে চেয়েছিল যে, এদের সহায়তা করার দরকার নেই এবং এদের একজনকে মুক্ত করতে যে টাকা ব্যয় হবে ঐ টাকা দিয়ে আমরা ১০-২০ জন নতুন ভাই তৈরী করব (নাউযবিল্লাহ)। আমি (লেখক) এটা শুনার পর অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাই নি। কারণ, এ ধরনের কথা তারাই বলতে পারে যাদের মধ্যে চরম অধঃপতন এসে গেছে। আর তখনও তাদের সাথে আমার দেখা হয় নি, যাদের সম্পর্কে ঐ কথা বলার অভিযোগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে, ঐ যুবকদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা হতে এটা নিশ্চিত হয়েছি, হ্যাঁ আসলেই তারা উপরোক্ত অপপ্রচার চালিয়েছে এবং বন্দীদের সম্পর্কে এমন কথা বলেছে। উপরন্তু এর উপর এমন সব ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষ্য পেয়েছি, যার ফলে ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে উক্ত অভিযোগ বিশ্বাস না করার কোনই কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য এদের মধ্য থেকে

অনেকেই পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছেন। তবে ৫-৭ জন থাকতে পারে স্বার্থাক্ষ হয়ে পুনরায় অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে বলে শুনা যায়।

আমি বলব এই ৫-৭ জন তারা শরীয়াহর আহকাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মুজাহিদদের ও বন্দী ভাই-ভাই বোনদের মর্যাদা-সম্মান সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাই এদের দ্বার বুহতান আর মিথ্যার ছড়াছড়ি হয়েই চলেছে। এদের আনুগত্য করা যাবে না, এদের হাতে জিহাদের নামে কোন টাকা পয়সা দেয়া যাবে না, এদের সাথে সময় অপচয় করারও কোন প্রয়োজন নেই, অন্যথায় বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আশংকা থেকেই যাবে। আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী ও চক্রান্তকারীদের ব্যর্থতা কামনা করছি।

আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য এবং ইমামদের বিভিন্ন রায় পর্যালোচনা করে এটা দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি যে, একটি ইসলামী সংগঠনের যতগুলো মৌলিক দায়িত্ব তার কর্মীদের বেলায় তার মধ্যে অন্যতম হল বন্দীদের সেবা ও মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছায় আমানতদার দায়িত্বশীলদের মাঝে বন্দীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নেই। তবে মনে রাখতে হবে কর্মী-সূধীদের নিয়েই সংগঠন। সুতরাং সামর্থ্যবান প্রতিটি কর্মী-সূধী ও শুভাকাংখী অবশ্যই তার ও তার পরিবারের খাদ্য ও পোষাকে ২-১ জন করে বন্দীদের শরীক করলে তা সংগঠনের জন্য বড় ধরনের উপকার হবে ইনশা আল্লাহ। সুতরাং আপনার পরিবারের খাবার ও পোষাকের জন্য যে বাজেট আপনি করে থাকেন তার মধ্য হতে অন্ততঃ ১০% তথা শতকরা ১০ ভাগ (কমপক্ষে) বন্দীদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ আপনার দায়িত্বশীলকে হস্তান্তর করার অভ্যাস গড়ে তোলার উপায় বিবেচনা করুন। সেই সাথে বন্দী মুক্তি ফান্ডে সাধ্যানুযায়ী দান অব্যাহত রাখুন। মনে রাখবেন যে, ১০% টাকা আপনি বন্দীদের খাবার পোষাক বাবদ তথা বন্দী কল্যাণ ফান্ডে দান করবেন। তা দ্বারা শুধু বন্দী ভাইটিই নয় বরং অনেক বন্দীর অসহায় পরিবারও উপকৃত হবে ইনশা আল্লাহ।

এছাড়া আরেকটি কথা মনে রাখবেন আপনার প্রতিবেশী বা বাসস্থানের আশে পাশে যদি কোন বন্দী পরিবার থেকে থাকে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া আপনার দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত। বন্দী পরিবারের খোঁজ-খবর নেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঐ বন্দীর যদি স্ত্রী থাকে তবে সে মর্যাদায় আপনার মা সমতুল্য। তার প্রতি খেয়ানত কিয়ামত দিবসে ভয়াবহ শাস্তির গ্যারান্টি হবে। সহীহ হাদীসের এটাই ভাষ্য। সুতরাং আমানতদারিতা, তাক্বওয়া, সতর্কতা ও নিরাপত্তার সীমারেখা গুলো মাথায় নিয়েই দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা আল্লাহর নিকট হেদায়াত, ইন্তেক্বামাত ও শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি ॥



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জবাবে মৃদু হাসলেন নাজি, যেন আইউবি তাকে মজার একটা কৌতুক শোনালেন।

নাজি অভিজ্ঞ সেনানায়ক। মিসর সেনাবাহিনীর অধিপতি। তার বাহিনীতে আছে পঞ্চাশ হাজার সুদানি, যারা সবাই প্রশিক্ষিত ও সুনিপুণ লড়াকু। নাজির মুচকি হাসির ভেদ আইউবি বুঝতে না পারলেও এতটুকু অনুধাবন করলেন যে, এই কুশলী ও বিজ্ঞ সেনাপতিটা তাঁর বড় প্রয়োজন। নাজি মিসরেই শুধু নয়- গোটা ইসলামি খেলাফতে একজন ধুরন্ধর সেনাপতি। আপন দক্ষতায় পঞ্চাশ হাজার সুদানি সৈনিকের একটা স্পেশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যরাই পালন করত শাসকদের দেহরক্ষীর দায়িত্ব। মিসর গভর্নরের নিরাপত্তার দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল নাজির স্পেশাল বাহিনীর উপর। এই বাহিনীর প্রতিজন সৈনিক নাজির অনুগত। তার নির্দেশে অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত সবাই। সুবিশাল একটি বাহিনীর কর্তৃত্বের বদৌলতে নাজি মিশর ও আশপাশের অন্যান্য শাসকদের জন্য ছিলেন একটা দ্রাস। শক্তিশালী সেনাবাহিনী আর কূটচালে নাজি এ অঞ্চলের মুকুটবিহীন সম্রাট। তাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন শক্তি কারো নেই। কূটকৌশলে নাজি এতই দক্ষ যে, সরাসরি সিংহাসনে আসীন না হলেও তাকে মনে করা হতো মসনদের কারিগর। নিজের কূটচালে যাকে খুশি ক্ষমতায় বসাতেন আবার মন চাইলে সরিয়ে দিতেন। প্রশাসনে নাজিকে বলা হতো সকল দুষ্টবুদ্ধির আধার।

সালাউদ্দীন আইউবির কথার জবাবে নাজির মুচকি হাসির তাৎপর্য অন্যদের বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু আইউবি অত গভীরে যেতে না পারলেও এতটুকু বুঝতে ঠিকই ধরে নিলেন, এই শক্তিদর সেনাপতিটা তার বড় বেশি প্রয়োজন।

‘অনেক পথ ভ্রমণ করে এসেছেন মহামান্য গভর্নর! খানিক বিশ্রাম নিন।’ বলল প্রবীণ এক অফিসার।

‘আমার মাথায় কর্তব্যের যে বোঝা চাপানো হয়েছে, সেই গুরুদায়িত্ব পালনের আমি যোগ্য নই। এই দায়িত্ব আমার

চোখের ঘুম আর দেহের আরাম কেড়ে নিয়েছে। আপনারা আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে চলুন, যেখানে কর্তব্যসমূহ আমার অপেক্ষা করছে।' বললেন আইউবি।

'দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে আহারটা সেরে নিলে ভালো হয় না মাননীয় গভর্নর?' আইউবির উদ্দেশ্যে বলল নাজির সহকারী।

একটু কি যেন ভাবলেন আইউবি। তারপর হাঁটা দিলেন সামনের দিকে।

বিশাল হল রুম। আইউবির ডানে নাজি, বাঁয়ে নাজির সেকেন্ড-ইন কমান্ড আদরোশ। সামনে ও পিছনে সশস্ত্র বডিগার্ড। দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে সবার মুখে একই ভাষা সালাম ও প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ)।

যেন গোটা হল রুম সালাম সালাম রবে মোহিত হয়ে উঠেছে। এখানে সব সৈনিকই নাজির স্পেশাল বাহিনী থেকে বেছে আনা হয়েছিল।

স্পেশাল বাহিনীর সৌকর্য, সৈনিকদের সুঠাম দেহ, উন্নত অস্ত্র, অভ্যর্থনা আর ইসলামী অভিবাদন দেখে আইউবির চোখদুটো আনন্দে চিকচিক করে উঠল। এমন একটি সুগঠিত বাহিনীর স্বপ্নই দেখছিলেন তিনি।

কিন্তু হলের প্রবেশদ্বারে গিয়ে আইউবি থমকে দাঁড়ালেন। সহসা তাঁর মুখের আনন্দ-দ্যোতি মিলিয়ে গেল। চিন্তার গতিতে ছেদ পড়ল।

সুরম্য হলঘর। প্রবেশপথে উন্নত গালিচা বিছানো। দরজায় পা রেখেই মলিন হয়ে গেল আইউবির চেহারা। মুখের উপর নেমে এল একরাশ বিষাদের ছায়া। তাঁকে দেখামাত্র চারটা উর্বশী তরুণী নৃত্যের ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন জানাল। তাদের হাতে ডালিভরা তাজা ফুল। ফুলগুলো শৈল্পিক ভঙ্গিতে ছিঁচিয়ে দিতে থাকল আইউবির পদতলে, তাঁর যাত্রাপথে।

মেয়েগুলোর পরনে মিহি রেশমের ধবধবে শাদা ঘাগরি। পিঠে ছড়ানো সোনালি চুল। ঝুলেপড়া জুলফি বাড়িয়ে তুলেছে মুখের জৌলুস।

তরুণীদের শরীরের দ্যুতি ফিনফিনে পোশাকের ফাঁক গলে বাইরে ঠিকরে পড়ছে। পাশাপাশি ওদের নৃত্যভঙ্গিমার তালে বেজে উঠল তবলা, সানাইয়ের সুর, সঙ্গীতের মূর্ছনা। (ঠিক যেন ইহুদী ও খ্রিস্টানরা লজ্জা পাবে এমন ভাবে তারা আইউবির জন্য অভিষেক অনুষ্ঠানকে সাজিয়ে ছিল)

তাজা ফুল পায়ের কাছে নিষ্কিণ্ড হতেই দ্রুত পিছিয়ে গেলেন আইউবি। ডানে নাজি আর বাঁয়ে তার সহকারী। তারা আইউবিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন।

মোলায়েম ফুল পাপড়ি মাড়াতে আসেনি সালাহুদ্দীন।' ঠোঁটে রহস্যময় হাসির আভা ছড়িয়ে বললেন আইউবি। এমন নির্মল হাসি আর কখনো দেখেননি নাজি।

'আমরা জনাবের চলার পথে আকাশের তারকাও এনে ছড়িয়ে দিতে পারি মাননীয় গভর্নর!' বললেন নাজি।

'আমার যাত্রাপথে শুধু একটি জিনিস বিছানো থাকলেই আমি খুশি হব।' গম্ভীর মুখে বললেন আইউবি।

'আদেশ করুন জাঁহাপনা! ; গদ গদ চিত্তে নাজির সহকারী বলল- কী সেই জিনিস যা আপনার পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলে আপনাকে আনন্দ দেয়?'

'ক্রসেডারদের লাশ।' ঈষৎ তচ্ছিল্যের সুরে মুচকি হেসে বললেন আইউবি।

নিমেষেই তার মুখখানি কঠিন হয়ে গেল। চোখ থেকে ঠিকরে বেরুতে থাকল অগ্নিবৃষ্টি। ভৎসনামাখা অনুচ্চ আওয়াজে বললেন- 'মুসলমানদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় জেনারেল।'

মুহূর্তের মধ্যে পান্ডুর হয়ে গেল অফিসারের মুখ।

আইউবি বললেন- 'আপনারা কি জানেন না, খ্রিস্টানরা মুসলিম সালতানাতকে ইঁদুরের মতো কুরে-কুরে টুকরো টুকরো করছে? বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে আমাদের? জানেন কি, কেন সফল হচ্ছে ওরা? যেদিন থেকে আমরা যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে ফুলের পাপড়ি মাড়াতে, আপন যুবতী কন্যাদের নগ্ন করে ওদের সম্মুখ ধুলোয় মিশিয়ে দিতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই ব্যর্থতা-ই হয়ে গেছে আমাদের বিধিলিপি। আমরা মাতৃত্বের মর্যাদা আর নারীর ইজজত রক্ষা করতে ব্যর্থ। আপনারা জেনে রাখুন, আমার চোখ ফিলিস্তিনের উপর নিবদ্ধ। আমার পথে ফুল বিছিয়ে মিসরেও কি আপনারা ইসলামের পতাকা ভুলুষ্ঠিত করতে চান।'

তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকটা একনজর দেখে জলদগ্ধীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন আইউবি-

'আমার পথ থেকে ফুলগুলো সরিয়ে নাও। ফুল মাড়িয়ে গেলে এই ফুলের কাঁটা আমার হৃদয়টাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। আমার পথ থেকে তরুণীদের হটাও। আমি চাই না, ওদের চুলের তারে আটকা পড়ে আমার তরবারি অকেজো হয়ে যাক।

আর-আর আমাকে কখনও 'হজুর কেবলা' বলে সম্বোধন করবেন না।' কঠোর ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন আইউবি। তাঁর তিরস্কারে অফিসারদের দেহ থেকে মাথাগুলো যেন সব আলাদা হয়ে গেছে।

'হজুর কেবলা' তো তিনি যাঁর আনীত কলেমা পড়ে আমরা মুসলামান হয়েছি। এই অধম তার নগন্য উম্মত মাত্র। আমি তাঁর পয়গাম বুকে ধারণ করেই মিসর এসেছি। তাঁর

আদর্শের সুরক্ষায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। খ্রিষ্টানরা আমার বুক থেকে এই পবিত্র পয়গাম ছিনিয়ে নিতে চায়, মর্দের জোয়ার রোমসাগরে ডুবিয়ে দিতে চায় ইসলামের পতাকা। আমি আপনাদের রাজা হয়ে আসিনি-এসেছি আমি ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হয়ে।’

নাজির ইশারায় তরুণীরা ফুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। এবার দ্রুত পায়ে হলরুমে প্রবেশ করলেন সুলতান আইউবি।

রাজকীয় দরবার হল। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিলে থোকা-থোকা ফুলের তোড়া। দীর্ঘ ও চওড়া টেবিলের চারপাশে সাজানো রাজসিক খাবার। আস্ত মুরগি, খাসির রান, দুধার বক্ষদেশের মোলায়েম গোশতের রকমারি আয়োজন। কক্ষময় খাবারের মৌতাত গন্ধ।

টেবিলের একপাশে সাজানো আইউবির জন্যে বিশেষ আসন। আইউবি ধীর পায়ে আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাশের এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন- ‘মিসরের সব নাগরিক কি এই মানের খাবার খেতে পায়?’ ‘না সম্মানিত গভর্নর! সাধারণ মানুষ তো এ রকম খাবার স্বপ্নেও দেখে না।’

‘তোমরা কি সেই জাতির সদস্য নও, যে জাতির সাধারণ মানুষ এমন খাবার স্বপ্নেও দেখে না?’

কারো মুখ থেকে কোনো জবাব বেরুল না।

‘এখানে ডিউটিরত যত কর্মচারী আছে, সবাইকে ভিতরে ডেকে আনো। এ খাবার তারা খাবে।’

আদেশ জারি করলেন আইউবি।

গালাহুদ্দীন আইউবি একটা রুটি হাতে নিয়ে তাতে দু-টুকরো গোশত যোগ করে খেয়ে নিলেন। তারপর নাজিকে নিয়ে গভর্নরের দফতরে চলে গেলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ গভর্নর হাউজ। দফতর নয়, যেন একটি জান্নাতি বালাখানা।

দাফতরিক প্রয়োজনের চেয়ে আয়েশি-উপকরণই বেশি। দফতরের বিন্যাসে মারাত্মক বৈষম্য। গভর্নর হাউজের দাফতরির পরিস্থিতি গভীরভাবে নিরীক্ষা করলেন আইউবি। তাঁর আগেই এখানে চলে আসা আলী বিন সুফিয়ান ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন গভর্নর হাউজের খুঁটিনাটি।

আইউবি নাজির কাছ থেকে জেনে নিলেন বিভিন্ন বিষয়। দু-ঘণ্টা পর নাজি গভর্নর হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং দ্রুত পায়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর একলাফে ঘোড়ায় চড়ে লাগাম টেনে ধরলেন।

প্রশিক্ষিত ঘোড়া ক্ষিপ্ৰগতিতে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নিঝুম রাত। নাজির খাস কামরায় জমে উঠেছে মদের আসর। আসরে যোগ দিয়েছে নাজির একান্ত সহযোগী দুই কমান্ডার। আজকের আসরের আমেজ ভিন্ন।

কোনো নৃত্য-গীত নেই। সবার মুখাবয়ব রুদ্ধ মরুভূমির মতো। গ্লাসের পর গ্লাস ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে সাকী। গোথ্রাসে গিলে যাচ্ছে তিন জন।

নীরবতা ভেঙ্গে নাজি বললেন-

‘এসব যৌবনের তেজ; বুঝলে? দেখবে, কদিনের মধ্যেই সব ঠান্ডা হয়ে গেছে।’

অভাগা কথায় কথায় বলে, ‘কা-বার রবের শপথ! ইসলামী সালতানাত থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত না করে আমি বিশ্রাম নেব না।’

‘হু! সালাহুদ্দীন আইউবি! তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করল এক কমান্ডার। ‘সে জানে না, ইসলামী সালতানাতের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। এখন হুকুমত চালাবে সুদানীরা।’

‘আপনি কি বলেন নি, স্পেশাল বাহিনীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সবাই সুদানী?’

-নাজিকে জিজ্ঞেস করল অপর কমান্ডার- ‘বলেননি, যাদের তিনি নিজের সৈন্য মনে করছেন, ওরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়বে না?’

‘তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে আদরোশ! আমি রবং তাকে আশ্বস্ত করেছি, এই পঞ্চাশ হাজার সুদানী শাদুল তাঁর অঙ্গুলের ইশারায় খ্রিস্টানদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। ওদের নিশানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। অচিরেই ওদের বিশ্বাসের প্রতীক ক্রুশ ভুলুপ্তি হবে। কিন্তু.....

থেমে গেলেন নাজি।

‘কিন্তু আবার কী?’ আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল দুই কমান্ডার।

নাজি বললেন- ‘সে আমাকে বলল, মিসরের নাগরিকদের নিয়ে একটি সেনা-ইউনিট গড়ে তুলুন। এক অঞ্চলের মানুষের উপর বাহিনীকে সীমিত রাখা উচিত নয়।’ সে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে মিসরীয়দের মিশ্রণ ঘটাতে চায়।’

‘তা আপনি কী বললেন?’

‘আমি তাকে বলেছি, শীঘ্রই আপনার হুকুম তামিল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আমি কখনই এমনটা করব না।’ বললেন নাজি।



তায়কিয়াতুন নুফুস

আত্মসমালোচনা কেন ও কীভাবে!

“নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পবিত্র করেছে।” (সূরা শামস : ৯; সূরা আ’লা : ১৪)।

“(সেদিন আল্লাহ বলবেন): তুমি নিজেই তোমার আমলনামা পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪)।

“আমি যা করলাম কেন করলাম, এর কতটা ন্যায় এবং কতটা অন্যায়;

যা করতে যাচ্ছি তা কেন করতে যাচ্ছি, কতটা সঠিক আর কতটা বেঠিক?”

নিজের মধ্যে এ দু’টি প্রশ্নের অবতারণা এবং প্রশ্ন দু’টি নিয়ে নিয়ত, ইখলাছ ও কুরআন-সুন্নাহর দর্পণে প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করাটাই হল আত্মসমালোচনা।

অন্য কথায় আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের চেহারা বা শরীরের খুঁত বা ত্রুটি নিজের চোখের সামনে ভেসে উঠে, আত্মসমালোচনা হল ঠিক তেমনি নিজের বিবেকের সামনে দাঁড়ানো। সমাজ জীবনের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হল- “দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত হল মানুষের নিজ নিজ বিবেক” উক্তিটির মূল্য এখানেই।

আমরা ইমাম আহমদ বর্ণিত একটি হাদীসে দেখতে পাই, একজন যুবক নবী (সঃ) এর কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চায়। রসূল (সঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন : “বসে যাও।”

অতঃপর নবী (সঃ) একে একে তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তোমার মা, বোন, ফুফু, খালা, মেয়ে এদের কারো সাথে কেউ ব্যভিচার করুক এটা পছন্দ কর কি? সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই চরম ভাবে না করল।

নবী (সঃ) প্রত্যেকবারই একে একে বললেন, এরূপ অন্যরাও তাদের মা, বোন, ফুফু, খালা, মেয়ে এদের বেলায় এটা সহ্য করে না। অতঃপর যুবকটি অনুতপ্ত হল ও তার ভুল বুঝতে পারল।

আত্মসমালোচনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়, অপরাধ ইত্যাদি বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ততা, অনুশোচনা আসে; পরবর্তীতে সংযম অবলম্বনের পথ খুঁজে পায়।

একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা, নবী (সঃ) বলেনঃ একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা ভালবাসে অপর মুমিন ভাইয়ের জন্যও তা ভাল না বাসবে। (সহীহ বুখারী)

সুতরাং আমরা কেউ যখন কোন ভাইয়ের উপর রাগান্বিত হই, কাউকে অপমানিত করি, কাউকে তুচ্ছ ভাবি, কাউকে কোন কষ্টকর বিষয়ের নির্দেশ দেই, কারও গীবত করি, কারও দোষ-ত্রুটি অশ্বেষণ করি, কাউকে খোটা দেই, কাউকে উপহাস করি, কারও নিন্দা বা সমালোচনা করি, বিতর্কে বা আলোচনায় নিজের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে অন্যদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করতে চাই তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অন্যরাও আমার বিরুদ্ধে এমন করলে আমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না।

সুতরাং কারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবস্থান নেয়ার আগে আসুন নিজের নিয়ত, ইখলাছ ও কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার দর্পন সামনে নিয়ে নিজেকে একটু জিজ্ঞেস করে নেই। এভাবে আত্মসমালোচনার ফলে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদে বেলায় আমাদের অসংগত আচরণ সমূহ ক্রমান্বয়ে সুসংগত হবে বলে আশা করি।

আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করছি ॥ আমিন ॥

কবিতার আসর

জাতিসংঘ ভাওতা বাজি

মকবুল হোসেন
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
ওটা শান্তি করে ভঙ্গ।
ওর শাখা অঙ্গসংগঠন
নিচ্ছে তারাই করে বন্টন
ওটা সুকৌশলে স্নায়ু জঙ্ঘ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
কৌশলে ছড়ায় কূটনীতি
দেখায় দাপট ভয়-ভীতি
সদস্যপদ চির আয়ত্তের অংক
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
তারা বিশ্বমুসলিম বৈরী
চুক্তি কানুন স্বার্থে তাদের তৈরী
ইসলাম বিদ্বেষীরাই তাদের সঙ্গ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
সব ক্রমতা কুক্ষিগত করে
বিশ্ব বাঁধিছে আপন করে
যেন কেউ না'রে করতে তা ভঙ্গ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
ঘন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদ খৃষ্টান
তাদের একই উদ্দেশ্য একই তান
এটা মুসলিম নিধন সরু সুড়ঙ্গ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
সুতা বাহানা খুঁজে বেড়ায়
মুসলিম ঘাড়ে দোষ চাপায়
(এরা) মুসলিম দেশ গ্রাসের ফানভূজঙ্গ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
ক্রশ যুদ্ধ ঘোষিছে বর্তমানে
মেতে উঠে খোলা ময়দানে
মার্কিন মোড়ল নীতি করে লঙ্ঘ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
ধ্বংসিছে কেবল মুসলিম জাত
দেখায় তাদের সজ্ঞাসের অজুহাত

এরা ইসলাম মুসলিম নাশের কীট-পতঙ্গ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?
আরতো সহ্য হয় না
হে মুসলিম ময়না!
চল মুসলিম জিহাদে জঙ্গ
কে বলে ওটা জাতি সংঘ?

নারী-পুরুষকে নহীহত

মোহাম্মাদ হোসাইন সালাফী
ওগো মাতা ওগো খালা ওগো আমার বোন
তোমাদের কথা কিছু শোন দিয়া মন।
যেই নারী পাঞ্জি গানা নামায পড়িবে
আর রামাযানের রোযা কভু না ছাড়িবে।
আর নিজ ইজ্জতের রাখিবে খেয়াল
স্বামী সেবা করে যাবে বাঁচো যত কাল।
তার জন্য জান্নাতের দ্বার খোলা হবে
সেই দ্বার দিয়ে ইচ্ছা, জানড়বাত চলে যাবে।
আরো কিছু শোন ওগো ভালবাসা বোন
পুরুষের জন্য নারী অমূল্য রতন।
দুনিয়াতে যত ধন পুরুষের আছে
সব থেকে মূল্যবান নারী তার কাছে।
কিন্তু সেই নারীরত্ন নেক বটে হয়
ইহ-পরকালে তবে হবে সুখময়।
দুনিয়াতে জাহান্নাম বদ নারী যার
ইহ পরকাল তার হবে ছারখার।
কষা জুতা পরে চলা যত কষ্টকর
তার থেকে বেশী কষ্ট বদ নারী যার।
শোনরে স্ত্রী-জাতী, কোরআনের ফরমান
পুরুষে হাকিম কইল, রহিম রহমান।
কেননা পুরুষজাতী, বহু কষ্ট করে
আহার ও পোশাক তোমায় দেয় জড়ো করে
এহেন পুরুষ তুমি রাজি যে রাখিলে
মরিয়ে জান্নাতে যাবে হাদীছেতে বলে।
শোনরে পুরুষ জাতী, কোরআনের ফরমান
তোমাদের নারী যদি হয় নাফারমান।
বুঝাইয়া দেখ তারে নানান প্রকারে
না বুঝিলে বিছানাতে দেহ জুদা করে।
এ দুই উপায়ে যদি ঠিক নাহি হয়
আদরের মার তবে কিছু মারা চায়।
অযথা মারিলে মার, আলাহ নারাজ হইবে
কিয়ামতের কোটে আলাহ হিসাব কষিবে।
মিয়া বিবি মিলে মিশে চালাবে সংসার
নইলে ইহ-পরকাল হবে ছারখার।

শ-ক-তি

ম.ন.আ.মিয়া

তোমরা যারা আজও ঘুমে মুসমিল নামের সেনা
শ-ক-তি তোদের নিয়েছে যারা নয় তারা কি চেনা?
ভিখারী তোদের সাজাল যারা নয় তারা কি চেনা?
মসনদ তোদের কাড়ল যারা নয় তারা কি চেনা?
রাজ্য তোদের হরল যারা নয় তারা কি চেনা?
নয় তারা কি চেনা? নয় তারা কি চেনা????
তবে কেন শ-ক-তি আজও তোদের হাতে ওঠে না?
তবে কেন রমি আজও তোদের হাতে ওঠে না?
তবে কেন হাত আজও তোদের গর্জে ওঠে না?
তবে কেন লহু আজও তোদের টবগে ওঠে না?
কেন ওঠে না? কেন ওঠে না? কেন ওঠে না?
ছিল রমি করলে রমি, রসনার পিছে ছুটে
ভরা পেটের জোগান দিতে রমি গেল টুটে
সকাল বেলা রাজা ছিলে ফকির সন্ধ্যা বেলা
বসে বসে জপছ শুধু সীব রবেই খেলা।
ভয়ে ভয়ে দিন গুজরানোয় লাভ দেখেছ বেশ
তসবি কলেমা নিয়ে ভাবছ দ্বীন করেছি শেষ।
অচেনা কে চেনার চেয়ে চেনায় চেনায় চেন
চেনায় তোমায় করলে নতি অচেনা আর হেন?
নওফাল তুমি আনফাল ষাটের হও পালনকারী
সকল শক্তি নতবে তোমায় হবে মান্য কারী।

ইসলামী হুকুমত

বজলুর রশীদ

সূর্যকে আড়াল করেছে কভু মেঘ নাকি কখনও
একটু পরেই আলোর ছটা বেরিয়েছে তখনও।
মাছি কভু তার পাখা দিয়ে তিমিকে ঢাকতে পারে?
আঁধারের কালিমা চাঁদ কভু নাহি ঘোচাতে পারে।
রবের দীনকে সূর্য জান তাগুতকে জেনে রাখ চাঁদ
ধরার সকল আঁধার ঘোচাতে সূর্য আনবে প্রভাত।
চাঁদ আর সূর্য কখনও তো আর সমান সমান নয়
দুয়ের মাঝে আছে বিশাল জয় আর পরাজয়।
সূর্য ধরার আঁধার ঘোচাতে প্রকাশ করেছে আলো
সেই আলোতে সকল মুমিন নাশে সকল কালো।
আসবে আবার খেলাফত আর উমরের শাসন ফিরে
ধরার বুকে আসবে শান্তি নিশ্চিত জীবন ঘিরে।
থাকবে না তাগুত, জুলুম, শোষণ, অবিচার-অনাচার
থাকবে সবার সত্য বলার নিশ্চিত অধিকার।
থাকবে সবার সৎ পথে চলার মৌলিক আয়োজন
থাকবে এক আল্লাহ তাআলার কুরআনের শাসন।
থাকবে না কেউ মজলুম আর একান্ত অসহায়
থাকবে না কেউ বসে বসে বেকারের দায়।
সবার সাথে সৌজন্য আচরণ হবে সালামের জয়
সালাম সালাম শান্তি শান্তি চমকাবে জগৎময়।
স্বর্গ এসে ধরা দেবে যেন নরকের এই দেশে
নরকগুলো লুকাবে যেন সত্যের পরশে।
আসবে আসবে আবার ফিরে সেই ইসলামী হুকুমত
সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবে আবার এ জগৎ ॥

গর্জে ওঠো

আসাদুল্লাহ আল গাঙ্গী

গর্জে ওঠো সিংহ শার্দূল মুসমিল মোজাহিদ
রমি হাতে সামনে চল তগুতের ভাংগ জিদ
মসনদে তাদের ধরাও আগুন কিংবা ত্রাসন
নিরাপত্তা নাও কেড়ে তাদের ধরাও কাঁপন।
জীবন থাকতে মার তাদের মস্তকে গর্দানে
মরণ কামড় হান তাদের জীবনে সংগোপণে।
মরণ ছোবল হান তাদের হৃদপিণ্ডের মাঝে
মাতাল করে ঘোরাও তাদের সকাল কিংবা সাঁঝে।
তাদের জীবন হাতের মুঠোয় বদ্ধ কর বীর
তাদের রক্ত দিয়ে ধরা স্নাত হৌক ফির।
কুফর রক্তের মূল্য কিবা কিবা মরা ছাগ
তাদের জীবন কঠিন কর কিংবা বরবাদ।
তগুতের লহর ঝরনা ধারায় গাও বিজয়ের গান
তাদের রক্তে হলি খেল বা করাও কুকুরে পান।
তগুতের দাপট মাছির ঘ্যান ঘ্যান কিংবা তারও নিচে ॥
তাদের বৈভব ধূলায় মেশাও খড়মের তলার পিচে।
তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি মাকড়সার জড় জাল
তাদের পারে কুকুর শিয়াল ছড়ালে বাহ্যিক খাল।
তারা সৃষ্টির অধম পশু তারও চেয়ে কুৎসিত
তাদের যেথা পাবে তাদের নষ্ট কর ভিত।
জিভ তাদের উপড়ে ফেল যদি বা হুংকারে
তাদের জীবন জিজিয়া ছাড়া পাঠাও সংহারে।
তাদের জীবন ব্যর্থ জীবন পালের গরুর মতো
আজ রেখেছে আগামী জীবন নাশাবে হয়তো।
তাদের দাপট চলা ফেরায় এ্যাম্বুস শত পাতো
উড়াও তাদের যানের বাহন ফোটা খইয়ে মতো।
তাদের দেখে ভয় কর না ওরা যে মরা লাশ
পাবে না ওরা তোমার দেখা যদিও থাক পাশ।
অন্ধ ওরা বধির কালা কিংবা আরও নিচে
তাদের তরে সোহাগ জমাও খড়ম তলার পিচে।
স্বপ্ন যদি ভাব আহা স্বপ্ন দেখাই বীরে-----
হয়তো একদিন দেখবে স্বপ্ন বাস্তবে এসেছে ফিরে।
থাকবে না কেউ বসে বসে বেকারের দায়।
সবার সাথে সৌজন্য আচরণ হবে সালামের জয়
সালাম সালাম শান্তি শান্তি চমকাবে জগৎময়।
স্বর্গ এসে ধরা দেবে যেন নরকের এই দেশে
নরকগুলো লুকাবে যেন সত্যের পরশে।
আসবে আসবে আবার ফিরে সেই ইসলামী হুকুমত
সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবে আবার এ জগৎ ॥



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আসলে আমরা অনেকেই ভাগ্যের পরিণাম না জানার কারণে হালুতাশ করি। হয়তো একটু পরেই কোন আনন্দের সংবাদ শুনানো হবে তবুও ঐ ব্যক্তি হয়তো কোন কারণে হালুতাশ বা ছটফট করছে নতুবা চিন্তায় মশগুল হয়েছে। অবশ্য এটা যে একেবারেই কেটে উঠা সম্ভব তা নয়, তবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিমাণের উপর এটা নির্ভর করে। যেমন আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম (আঃ) শত বিপদের মুখেও হালুতাশ বা চিন্তায় মশগুল হন নি বরং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছেন শতভাগ। শত পরীক্ষাতেও তার সফলতার সেধুরী আমরা দেখতে পাই। আবার মানবিক আচরণ কোন নবীকেও ছাড় দেয়নি যেমন হযরত মুসা (আঃ) সাপ দেখে ভয়ে দৌড় মেরেছিলেন। পরে অবশ্য যখন আল্লাহর নির্দেশ হলো ধরার তখন তিনি ভয়ভীতিহীন ভাবে তা ধরেছেন। (এর কারণ, আমার মনে হয় তার মনে এই বিশ্বাস এলো যে, সাপ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কাউকে দংশন করতে পারে না। যেমন যাদুর ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, ওটা তার ইচ্ছা ব্যতীত কারও ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না।) যাই হোক এবার আমরা ঘটনার দিকে ফিরে যাব। আমরা মুজাহিদ বাহিনীকে এক সংকটাপন্ন অবস্থায় পেয়েছি। এক্ষণে টিম কমান্ডার হাসান মাহমুদ একটু সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগছিলেন কারণ এই মুহূর্তে তিনি কি নির্দেশ দিবেন। হঠাৎ তো বলে ফেললেন যে, ক্রোলিং ও আলো উৎপাদন কর।

এটা হলো এই যা না জানার কারণে সাধারণত মানুষের স্বভাবতই ঘটে থাকে। এটা হাসান মাহমুদকেও পেয়ে বসল। সে আউজু বিল্লাহ পড়ে বার বার আল্লাহর কাছে এস্টেগফার ও দোয়া করতে লাগল। সে ভয় পেল যে না জানি আজ তার কৌশল প্রয়োগের কারণে কত ভাইকে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে হলো। ইতিমধ্যে

চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষণিক আলোর ছটায় মাথা উচু করে হাসান মাহমুদ দেখতে পেল হাজার হাজার লাশ পড়ে আছে। কেউ দন্ডায়মান নেই।

এটা কৌশল কিনা যাচাইয়ের জন্য পরপর দুবার একই সঙ্গে আলো উৎপাদন করতে নির্দেশ দিলেন কমান্ডার। আদেশ পালিত হলো পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে। এরই মধ্যে দক্ষ তীরন্দাজের নিকট নির্দেশ গেল প্রথম আলোয় নিশানা ঠিক করবে। দ্বিতীয় আলোয় শত্রুর কাউকে নিক্ষেপ করবে। দেখা গেল নিক্ষিপ্ত তীর শত্রুর বুকে বিদ্ধ হলো কিন্তু সে নড়ল না পর্যন্ত।

এ দৃশ্যদেখে হাসান মাহমুদ আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলেন। সঙ্গে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে দিগন্ত যেন কেঁপে উঠল।

অতঃপর তারা টর্চ জ্বেলে নিজেদের সাফল্য দেখতে পেল। হাসান মাহমুদ বললেন, এই সফলতার কোন কৃতিত্ব আমাদের নয় বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই বিজয়ী করেন। তাই এই বিজয়ের শুকরিয়া স্বরূপ তিনি সেজদা করলেন। তার দেখে সকল মুজাহিদ শকরানা সেজদা করল। সবাই আল্হামদুলিল্লাহ বলে কমান্ডারের নির্দেশ শোনার জন্য চুপ হলো। এই বিজয় মুজাহিদ বাহিনীকে যা দিল তা কখনও টাকা দিয়ে পাওয়ার ছিল না। তারা লাভ করলেন অনেক অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ভান্ডার। অস্ত্র গুলোর নামও অনেককের জানা ছিল না। এমনি একটি অদ্ভুত অস্ত্র নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন হাসান মাহমুদ। সেগুলোর বুলেট দেখতেও অদ্ভুত। একটা বুলেট ছুড়লেন একটা নিশানাকে তাক করে কিন্তু তার কোন ক্ষতি তো করলই না বরং সেটা সুন্দরভাবে তাতে। তার মনে হলো বুলেটা আঘাতের পরিবর্তে লক্ষ্যবস্তুর সাথে দোস্তী করছে এবং তার সাথে সুন্দর ভাবে আটকে পড়ছে। না, এটা নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়। তারা ফিরে এলেন। কিন্তু ঐ অস্ত্র ও বুলেটের বাক্সগুলোকে আলাদা করে তার বহন ও হেফাজতের দায়িত্ব নিজের হাতেই রাখলেন।

বেশকিছুদিন পর হাসান মাহমুদের গোয়েন্দা টিমের প্রধান এলেন। বললেন, একান্তে তিনি কমান্ডারের সাথে আলাপ করবেন। গোয়েন্দা প্রধান আবু সুফিয়ান কমান্ডারকে যা জানালেন তা হলো খ্রিষ্টনারা এবার ইহুদীদের সাথে নিয়ে কিছুদিন আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দুইজাতির সমস্ত সৈন্যথেকে বাছাই করা দুর্ঘট ও চৌকস সৈনিকদের নিয়ে একটি সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছে। তারা হাসান মাহমুদের সমস্ত সৈনিকদের একেবারে জ্যান্তকবর দেওয়ার জন্য বিশেষ কমান্ডো প্রশিক্ষণ

নিচ্ছে। তারা যেমন দুর্ধষ গেরিলা, তেমনি কষ্ট সহিষ্ণু মরুভূমির জাহাজের মতো। তারা এক সঙ্গে বিশজন বডি বিস্তার সৈনিকদের নাস্তানাবুদ করতে পারে হস্তযুদ্ধে, হারাতে পারে ছোটখাটো হাতিকেও কুস্তিতে, মল্লযুদ্ধে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি জীবিত ফেরত এ পর্যন্ত আসে নি।

শুধু তাই নয় তারা যেমন আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে ওস্তাদ তেমনি তলোয়ার। তলোয়ার গেলে মল্ল, কুস্তি আর হস্তযুদ্ধেও তারা সমান দক্ষ। তাদের প্রত্যেকেই এক এক কমান্ডো সৈনিক। তারা সাধারণ সৈনিক নয় কেউই। তারা যেমন দুর্ধষ তেমনি তাদের দেওয়া হবে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র। থাকবে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান ও নতুন নতুন সব মর্টার ও রকেট লাঞ্চার। সেই সাথে থাকবে কম্পিউটার চালিত ড্রোন। যে শুধু ক্ষতিই করবে কিন্তু তার ক্ষতিকারীর সংখ্যা খুবই কম।

সব শুনে হাসান মাহমুদ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি বলতে পারতেন, আরে যা, ওদের অতোসব আয়োজন তো একজন ফেরেস্টাই শেষ করে দিবে। (কিন্তু ফেরেস্টা আসবেই এটা কি চুক্তি হয়েছে আল্লাহর সাথে)। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। চিন্তা করতে করতে কখন যে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন তা খেয়ালই করেন নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলেন আবু সুফিয়ান সেই একই ভাবে বসে আছেন।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নিরব থাকার পর প্রথম মুখ খুললেন, হাসান মাহমুদ। বললেন, ভাই আবু সুফিয়ান, আল্লাহর তোমার মঙ্গল করুন যে, তুমি এমন একটি খবর যথাসময়ে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছ নতুবা আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকতাম তখন শত্রুরা আমাদের ভাগাভাগি করতো যে, কে কাকে কিভাবে মারবে। কে কার স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে আমোদফুর্তি করবে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আবু সুফিয়ান জানে, হাসান মাহমুদ কোন খন্ড খবর ভালোবাসে না। তাই নতুন শত্রু টিমের সকল খবরা খবর সে আনতে সক্ষম হয়েছে যাতে কমান্ডার সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারেন। এসব খবর আনতে যেয়ে খরচও কম হয়নি। ইতিমধ্যেই শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে চারজন। শাহাদতের পেয়ালাও পান করেছে তিন জন। যাই এসব ত্যাগের বিনিময়ে সে তথ্য সাফল্য এসেছে তা মুসলিম ভূখন্ড রক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনবে বলে আবু সুফিয়ান মনে করেন।

হাসান মাহমুদ দুর্ধষ গোয়েন্দাটিমের খবর নিলেন। নিহতদের জন্য সবাই কে নিয়ে গায়েবানা জানাজা ও কল্যাণের দোয়া করলেন।

কিন্তু সর্বোপরি তিনি যে, সিদ্ধান্ত নিলেন, তা হলো বন্দি চারজন গোয়েন্দা কে মুক্ত করা। পাশা পাশি তিনি আলি করিমকে নির্দেশ দিলেন যথাসীঘ্র একটি দুর্ধষ তীরন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য যাদের বৈশিষ্ট্য হবে তারা যেন একটা মোলের ছিদ্রকেও নিশানা বানাতে পারে। এজন্য তিনি সমস্ত সৈনিক থেকে বাছাই করে মোট পচাত্তর জনের একটি টিম গঠন করার নির্দেশ দিলেন। সমস্ত সৈনিককে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একজন কমান্ডার নিযুক্ত করলেন। নির্দেশ দিলেন তারা যেন উঁচু উঁচু গাছ বা স্থান থেকে মাটিতে লাফ দেওয়ার ট্রেনিং নেয়। প্রয়োজনে যেন দশ বিশ তলা ছাদ থেকেও লাফ দিয়ে স্বাভাবিক চলা ফেরা করতে পারে। যারা এমনটি করতে পারবে না তাদের আলাদা তালিকা করতে বললেন।

আরো পাঁচ জন অপেক্ষমান কমান্ডার নিযুক্ত করলেন, যারা লাফাতে ব্যর্থ হবে সেই সব মুজাহিদদের কে তারা যেন রকেট ছোঁড়া, কামান ছোঁড়া ও রাইফেল ছোঁড়ায় দক্ষ বানিয়ে নেয়। এমন কি তারা যেন দৌড়ে বা ঘোড়ার পিটে সওয়ার হয়েও নিশানা ভেদ করতে পারে। এটাতেও যারা অপারগ হবে তাদেরকে তিনি তার কাছে পাঠাতে বললেন। এভাবে এক সপ্তাহ গেল। পুরো সপ্তাহ হাসান মাহমুদ সেই বেখাপ্পা অস্ত্রটা নিয়েই গবেষণা করতে থাকলেন। একদিন আবিষ্কার হলো বিশাল এক অস্ত্রের যা এতদিনে তার কল্পনাতেই আসে নি। কিন্তু আবিষ্কার আর কেউ করল না, তা তার অবুঝ একটি ছোট সন্তান। সেও তো আর বুঝে কাজটি করে নি। তবে, কিভাবে আবিষ্কার হলো এটি, হ্যা, এটাই তো আল্লাহর সাহায্য, এভাবেই আল্লাহ যাকে চান সাহায্য করেন। অস্ত্রটা ঠিক রাইফেলের মতো দেখতে। কিন্তু নলটি দুই ইঞ্চি পাইপের মতো মোটা। এরূপ অস্ত্র পাওয়া গেছে ৫০টি। বুলেট গুলো ঠিকা বাতাসার মতো গোল পুরু প্রায় দুই ইঞ্চি। ম্যাগজিনে একই সঙ্গে ১০টি বুলেট ধরে। একটি একটি করে ফায়ার করতে হয়। ফায়ার করার সময় কোন আওয়াজ হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো ছুড়লে এগুলো দেয়াল বা দরজা জানালা অথবা পর্দায় আটকে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো এতে কি লাভ হলো। এরূপ বুলেটের ম্যাগজিন পাওয়া গেছে প্রায় ৩১০টি। ম্যাগজিনের বাস্তবে পাওয়া গেল পাঁচটি রিমোট। একই ধরনের। দেখে বুঝা যায় এগুলোর প্রতিটির কাজ একই শুধুমাত্র নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার ভয়েই সংখ্যা পাঁচটি করা হয়েছে। পরীক্ষা করতেই ইতিমধ্যে একটা ম্যাগজিনের অর্ধেক শেষ হয়েছে। কিন্তু কোন রেজাল্ট বের করতে পারলেন না

হাসান মাহমুদ। যা পারল তার দুই বছরের ছেলে রিফাত। এতে একটা জিনিসই প্রমাণিত হয় যে, জগতে যত আবিষ্কার আর রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে তা কোন বিজ্ঞানীর একক কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা তা সহজ করে দেন, কৌশল প্রকাশ করে দেন, তার হৃদয়ে ওটা সেট করে দেন, একটা উপায় বের করে দেন, তার মনে উক্ত বিষয়টির একটা চূড়ান্ত চিত্র তুলে ধরেন ফলে উক্ত বিষয় তার কাছে একান্ত সহজ হয়ে যায়। ফলে ওটা তার আয়ত্বে এসে যায়। যেমন দুই বছরের ছোট ছেলেটি তো আর কোন অভিজ্ঞতা রাখে না, সে ওটা নিজের চিন্তা ভাবনা থেকেও করেনি বরং চিন্তা ভাবনার বয়সই তার হয়নি। সে ওটা খেলাচ্ছলে করছিল মাত্র। যেমনটি বলা যায় কোন আল্লাহ প্রেমিক একান্ত ভাবে চাইল যে, আহা এই মুহূর্তে যদি সে উষার আলো দেখতে পেত। সে এশার পর থেকে ফজরের আকাংখায় চোখ বুজে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল ছিল। সে যখন এটা চাইল ঠিক ঐ মুহূর্তেই উষার আরম্ভ হয়েছিল। তাই সে আল্লাহর উপর ভরসা করে চোখ মেলল আর উষা দেখতে পেয়ে ভাবল যে, আল্লাহ তার কথা রেখেছেন। আসলে কী রেখেছেন, তার চাওয়ার কারণেই কী তখন উষার আলো ছড়াচ্ছিল। না, কখনই নয়। বরং আল্লাহ যখন কারো প্রিয় হন তখন তার চাওয়া পাওয়ার সাথে আল্লাহর ইচ্ছার একটা অদৃশ্য মিল হয়ে যায়। যেমনঃ কোন ব্যক্তির খুব ইচ্ছা হরো সে তন্দুর রুটি আর খাসির গোস্ত খাবে। তখন রাত তিনটা। সুতরাং এটা ঐসময় ঘরের মধ্যে পাওয়া খুবই দুরূহ। এদিকে গ্রামের এক বাড়িতে ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। সেখানে নাস্তা হিসেবে ছিল ঐ জিনিস যা ঐ ব্যক্তির খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। সে ভাবা মাত্রই দরজায় ঠকঠক আওয়াজ। দেখল যে, এক বয়স্কলোক তন্দুররুটি ও খাসির গোস্তের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে। লোকটি বলল, মশাই অনেক খাবার বেঁচে গেছে তাই নষ্ট না করে সবার বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে বেড়াচ্ছি। খুবই সুস্বাদু খাবেন পুজ, নষ্ট করবেন না মশাই। ইচ্ছুক লোকটি সংগে সংগে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, ভাই কে জানে আমার দোয়া সংগে সংগে কবুল হবে! আমি আমি যদি মাগফেরাত ও জান্নাতের জন্য দোয়া করতাম! দোয়াটি কবুল হয়েছিল। এটাও কবুল হতো। এই ঘটনার পর লোকটি যখনই দোয়া করতো জান্নাতুল ফেরদাউস ও জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাইতে ভুল করতো না। এটা সবার জন্য একটি শিক্ষা হতে পারে। মানে আমরাও যে কোন বিষয়ে দোয়া করার সময় লোকটির আরাধ্য বিষয় চেয়ে দোয়া করতে পারি। আল্লাহ তৌফিক দিন। আমিন। (চলবে)



৭ রমণী পৃথিবীর শ্রে'সম্পদ

আবদুল্লাহবিন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) বলেন, “পৃথিবীটা হচ্ছে ভোগের বস্তু। আর পৃথিবীর মধ্যে শ্রে'সম্পদ হচ্ছে নেক রমণী।” মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুক্ষপান, হা/২৬৬৮

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) বলেন, “চারটি গুণের কারণে কোন রমণীকে বিবাহ করা হয়, তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্মভীরু। ধর্মভীরুনারী বিবাহ করে তুমিবিজয়ী হও। তোমার দু'হাত ধুলোলুষ্ঠিত হোক। (বুখারী অধ্যায়ঃ বিবাহ, হা/ ৪৭০০। ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুক্ষপান, হা/ ২৬৬১।

নবী (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) আরো বলেন, “চারটি বস্তু সৌভাগ্যের ১) নেক রমণী ২) প্রশস্ত আবাসস্থল ৩) সৎ প্রতিবেশী এবং ৪) আরাম দায়ক আরোহী। আর চারটি বস্তুতে রয়েছে দুর্ভাগ্য। ১) অসৎ নারী।...” (হাকেম প্রমুখ, শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, দ্রঃ (ছহীহুল জামে হা/৮৮৭)

এ সমস্ত উক্তি ও অনুরূপ আরো অনেক হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলিম পুরষের জীবন সঙ্গী নির্বাচন করার জন্য একজন নেক ও সৎ রমণী অনুসন্ধান করা কত গুরুত্বপূর্ণ। আর মুসলিম রমণীর উপর আবশ্যিক হচ্ছে নেক স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বোত্তম গুণাবলী সমূহ অর্জন করার চেষ্টা করা যাতে আলাহতার উপর সন্তুষ্ট হন। ইহ-পরকালে তার জীবন হয় পূণ্যও সফলতায় পরিপূর্ণ। হে মুসলিম বোন! নিম্নে নেক রমণী হওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরী নেক মনিষীদের কতিপয় উক্তি সন্নিবেশ করা হল। এগুলোর মাধ্যমে শিখুন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করুন। কেননানবী

(ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) বলেন, “শিক্ষা অর্জন করার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায়, ধৈর্যের অনুশীলনের মাধ্যমে সহিষ্ণু হওয়া যায়। যেব্যক্তি কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে, তাকে উহা প্রদান করা হয়।” (দারাকুতনী, আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন- ছহীহুল জামে’ হা/২৩২৮)



আলাহতা’আলা বলেন,

□ فَاَلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“পূণ্যবতী রমণীগণ আনুগত্য করে এবং আলাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্নভবিষয়ের সংরক্ষণ করে।” (সূরা নিসা- ৩৪) হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, **صَالِحَاتٌ** বলতে সং ও পূণ্যশীলনারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস প্রমুখ বলেন, **قَانِتَاتٌ** অর্থ হচ্ছে, স্বামীর আনুগত্যকারীণী। **حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ** অর্থ সম্পর্কে সুদীপ্রমুখ বলেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী নিজের ইজ্জতের সংরক্ষণ করবে এবং স্বামীর সম্পদ হেফায়ত করবে। (ইবনু কাছীর ১/৭৪৩)

আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন, “মুসলিম রমণী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি ভিতরে প্রবেশ কর।” (মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৭৩ ইবনু হিব্বান, শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, দ্রঃ (ছহীহুল জামে হা/৬৬০)

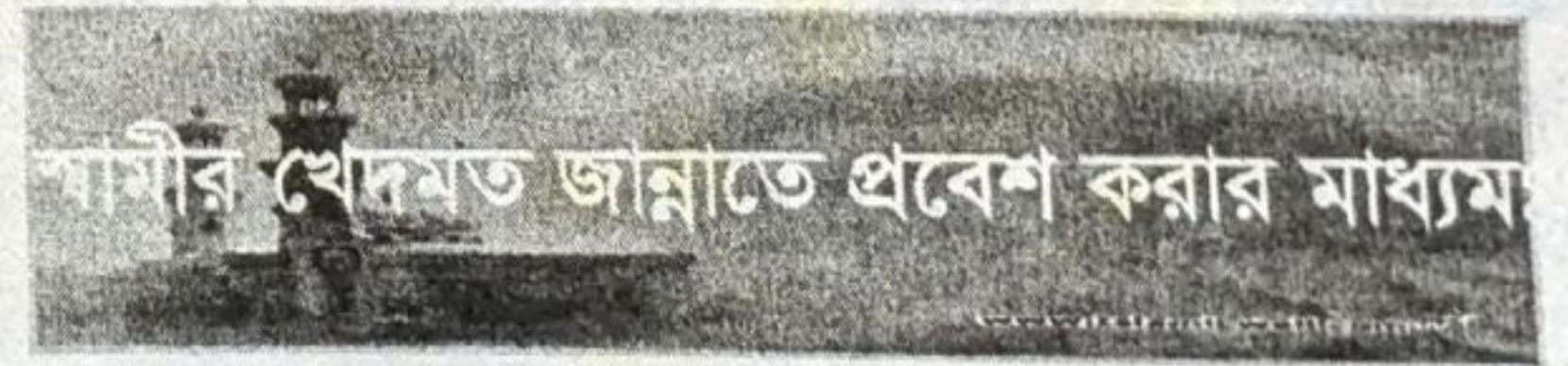
আনাস বিন মলেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) আরো বলেন, “কোন ধরণের রামণী জান্নাতী আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ হে আলাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমাদের জানড়বাতি রমণীগণ হচ্ছে, স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারীণী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারীণী। তার আনুগত্যের প্রকাশ হচ্ছে, সেরাগম্বিতা হলে বা তার সাথে খারাপ আচরণ করা হলে বা স্বামী তার প্রতি রাগাম্বিত হলে, স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, এই আমার হাত আপনার হাতে সপে দিলাম, আপনি সম্বুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখের পলক ফেলব না। অর্থাৎ আমি কোন আরাম নিব না কোন আনন্দ বিনোদন করব না যতক্ষণ আপনি আমার প্রতি খুশি না হন।” (তুবরানী, শায়খ আলবানী

হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, দ্রঃ (সিলসিলা ছহীহা- হা/২৮৭।)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) কে জিজ্ঞেস করা হলো হে আলাহর রাসূল! কোন শ্রেণীর নারী সর্বোত্তম? তিনি বলেন, “তার পরিচয় হচ্ছে তুমি তার দিকে চাইলে সে তোমাকে আনন্দিত করবে, কোন নির্দেশদিলে তা বাস্তবায়ন করবে। তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামী পসন্দ করেন না এমন কাজ করে তার বিরোধীতা করবেনা।” (ছহীহ সুনান নাসাঈ অধ্যায়ঃ বিবাহ, হা/ ৩১৭৯।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, “আমি কি তোমাকে মানুষের আকর্ষণীয় শ্রেণীতে সম্পর্কে বলেদিব না? তা হচ্ছে, নেক রমণী। স্বামী তার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দিত করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং বাড়িতে না থাকলে তার ইজ্জত-আবরু রক্ষা করে।” (আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ যাকাত, হা/১৪১৭।)

ওহে মুসলিম বোন নিজের প্রতি লক্ষ্য করুন, উক্ত গুণাবলী কি আপনার চরিত্রে সমাবেশ ঘটাতে পেরেছেন। আপনি কোথায়? আপনার কি উচিত নয় পালনকর্তার সম্বুষ্টির পথ অনুসন্ধান করা? দু’নিয়া-আখেরাতে সুখের জীবন গঠন করার জন্য স্বামী-সন্তানের খেদমত করা ও আনন্দময় সংসার গড়তে সচেষ্ট হওয়া?



হুছাইন বিন মেহছান (রাঃ) বলেন, আমার ফুফু আমার কাছে বর্ণনাকরেছেন। একদা তিনি নবী (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) কাছে কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। প্রয়োজন শেষ হলে নবী (ছালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার জন্য তুমি কেমন স্ত্রী? আমি বললাম, একান্ত অপারগ না হলে তার খেদমত করতে কোন ত্রুটি করি না। তিনি বললেন, ভালভাবে খেয়াল রাখবে, তুমি কিরূপ তার খেদমত করে থাক। কেননা সেই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।” (আহমাদ হা/১৮২৩৩, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ আদাবুয যাফাফ- আলবানী পৃঃ ২৮৫)

অর্থাৎ- তার অনুগত্য ও খেদমত করলে জানড়বাতে যাবে আর অবাধ্যহলে জাহানড়বামে যাবে। শায়খ আলবানী বলেন, 'এই হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে এ দলীল পাওয়া যায়, স্বামীর অনুগত্য করা স্ত্রীর উপরওয়াজিব এবং সাধের মধ্যে তার খেদমত করা তার উপর আবশ্যিক।

সন্দেহ নেই যে, খেদমতের প্রথম বিষয় হচ্ছে, স্বামীর গৃহের তদারকিকরা তার সন্তান-সন্তৃতিকে সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করা।'

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ

(হালালাহুআলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন,

□ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَّائَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ
“যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতিসন্তুষ্ট, সে জানড়বাতে প্রবেশ করবে।” (তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুষ্কপান, হা/১০৮১, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ বিবাহ, হা/১৮৪৪।)

জান্নাতী নারীর কতিপয় আলামত

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ থেকে জান্নাতী রমণীর পরিচয়ে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

- ১) জান্নাতী রমণী নেক ও পুণ্যের কাজে অংশ নেয় এবং আপনপালনকর্তার ইবাদত করে তাঁর হক আদায় করে।
- ২) জান্নাতী রমণী এমন ক্ষেত্রে স্বামীর অনুগত্য করবে যাতে আলাহরনাফরমানী নেই।
- ৩) নিজের ইজ্জতের হেফায়ত করবে- বিশেষ করে স্বামীর অনুপস্থিতিতে।
- ৪) স্বামীর সম্পদের হেফায়ত করবে ও তার সন্তানদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করবে।
- ৫) সর্বদা এমনভাবে স্বামীর সম্মুখবর্তী হবে যাতে তিনি খুশি হন এবং এজন্য নিজের অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও হাসি মুখ তার সামনে প্রকাশকরতে সচেষ্ট হবে।
- ৬) স্বামী রাগম্বিত হলে যে কোন প্রকারে তাকে খুশি করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে। কেননা সেই তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। যেমনটি ইতোপূর্বে হাদীছে উল্লেখ হয়েছে।
- ৭) স্বামী তার সঙ্গ চাইলে কোনভাবেই তাতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেনা। তার ডাকে সাড়া দিবে এবং পরিপূর্ণরূপে নিজেকে তার কাছে সমর্পন করবে।

জান্নাতের অঙ্গীকার

উল্লেখিত কাজগুলো করলেই প্রিয় নবীজীর ভাষায় তার জান্নাতে প্রবেশ করার অঙ্গীকার রয়েছে। যেমনটি তিনি এরশাদ করেনঃ স্ত্রী যদিঃ

- ১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে।
- ২) রামাযানের ছিয়াম পালন করে।
- ৩) নিজ লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে। (ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে বিরত থাকে।) এবং
- ৪) স্বামীর অনুগত্য করে।

তবে তাকে বলা হবে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ কর। (মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৭৩। ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে হা/৬৬০)

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

আ.হ.ম. কোরাইশী

স্বামীর উপর যেমন স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীর উপরও স্বামীর অধিকার রয়েছে। আজ আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দেখব স্ত্রীর উপর স্বামীর কি কি অধিকার রয়েছে। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেনঃ

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগত্য এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাজতে (আদেশ ও তওফীকে) তারা তা হিফাজত করে। (সূরা নিসা আয়াত নং ৩৪)

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪র্থ খন্ডের ৩৮৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর

নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়ত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘এসব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়।’ (সহীহ বুখারী)

অন্য জায়গায় রয়েছে, অর্থাৎ তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। ‘(বাকারা আয়াত নং ২২৮) এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীরে একটি হাদীস এসেছে তা হলোঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হেফাজত করা। ইত্যাদি। (ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৮৬)

একজন আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর স্ত্রী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ‘হে আল্লাহর রসুল! আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। ওর চিহ্ন এখনও আমার চেহারায় বিদ্যমান রয়েছে।’ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেনঃ ‘তার এ অধিকার ছিল না।’ সেখানেই সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘আমি চেয়েছিলাম এক রকম এবং আল্লাহ তা’আলা চাইলেন অন্য রকম।’

উক্ত আয়াতে আরও রয়েছে যে, স্ত্রী আনুগত্যের আওতায় না আসলে স্বামীর উচিত স্ত্রীকে ওয়াজ নহীহত করা, সদুপদেশ দেওয়া এবং এতসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ বলেনঃ এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা হয়, তবে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর। দেখা গেল সদুপদেশে কাজ হলো না। তখন স্বামীর ২য় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর শয্যা পৃথক করতে হবে। একত্রে শোয়া যাবে না। এটা নারীদের জন্য ভীষণ বেদনাদায়ক বটে। এতেও যদি কাজ না হয় তবে তৃতীয় ব্যবস্থা হিসেবে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করার অধিকার

রাখেন। যেমন এই দুই ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ ‘এবং তাদের শয্যা হতে পৃথক কর ও তাদেরকে প্রহার কর। যদি এই তিন ব্যবস্থার পর স্ত্রী অনুগত ও মুমিনা হয় তবে আল্লাহর শেষ নির্দেশ হলোঃ অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্যে অন্য পস্থা অবলম্বন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান। (নিসা আয়াত নং ৩৪)

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সংক্রান্ত বহু হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে আমরা কিছু হাদীসের অবতারণা করলাম। যেমন আবুহোরাযরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ‘যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে অতপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায় তাহলে ফিরিস্তাগণ সকাল অবধি তাকে অভিসম্পাত করতে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রি যাপন করে তখন ফিরিস্তাগণ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।

আরেক বর্ণনায় আছে যে, ‘সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে। কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহ্বান করার পর, সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

আবুহোরাযরা রাজিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেনঃ ‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নারীর জন্য নফল রোজা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়াও তার জন্যে বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল।

সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার

পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তেমনি প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু আলী ত্বালক ইবনে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহ্বান করবে, তখন যে যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায়। যদিও সে উনানের কাছে (রুটি ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে। (তিরমিযী হাসান সূত্রে)

আবুহোরাযরা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমি যদি কাউকে কারো জন্য সেজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সেজদাহ করে।' (তিরমিযী হাসান সূত্রে)

উম্মু সালামহ রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা হাসান হাদীস।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখনই কেন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হর (বেহেশতী) স্ত্রী (অদৃশ্যভাবে) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। ওকে কষ্ট দিস্ না। ওতো তোর নিকট সাময়িক মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে। (তিরমিযী)

উসামাহ ইবনে যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর অন্য কোন ফিতনা ছাড়লাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রিয় পাঠক, আমি মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা স্বামীর আনুগত্যের পাশাপাশি আরও একটি

কাজ করবেন। তাহলো প্রতিদিন রান্নাবান্নার সময় এক মুকিরে চাল আপনারা আলাদা করে রাখবেন।

ঐ একমুচিাল সরালেও ইনশা আল্লাহ বরকতেই তা পূর্ণ হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনাদের এই সম্মিলিত হাতের মুষ্টির চাল দিতে পারে আল্লাহর পথের কোন পথিকের হাতের মুষ্টিভরা সঙ্গিন। আজ আপনাদের এই সামান্য খেদমত হতে পারে বিশাল কিছু।

আবার আমি ভাইদের বলব, আপনারা যতবার বাজারে যাবেন, প্রতি বাজার হতে দু একটি কয়েন একটি মাটির ব্যাংকে জমান। হতে পারে আপনার এই দুইএকটা কয়েনের মাধ্যমে বড় কোন কাজে হবে আনজাম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওফিক দান করুন। আমিন।

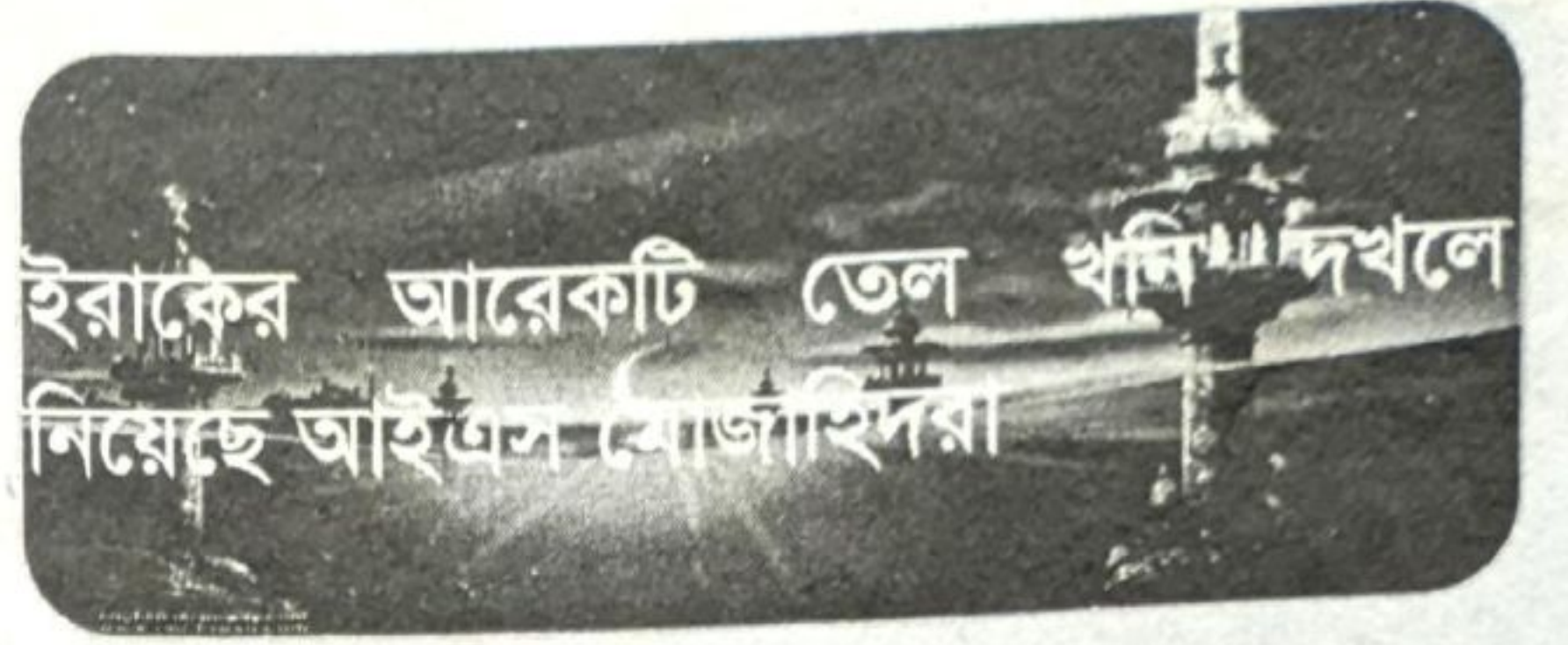


ফ্রান্সের শার্লি এবদুতে হামলা চালিয়ে ১২ জনকে হত্যাকারীরা ইয়েমেনের আলকায়দা নেতা আনওয়ার আওকালির কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৫-১-২০১৫ তারিখ শুক্রবার পুলিশের গুলিতে নিহত দুই ভাইয়ের একজন ৩২ বছর বয়সী শেরিফ কোয়াশি বি এফ এম টিভিকে মৃত্যুর আগে টেলিফোনে এই তথ্য দিয়েছেন। টেলিফোনে শেরিফ কোয়াশি বলেন, ইয়েমেনের আল কায়দা আমাকে ঐ হামলার জন্য পাঠিয়েছে এবং এবং অর্থ দিয়েছে। সন্দেহ

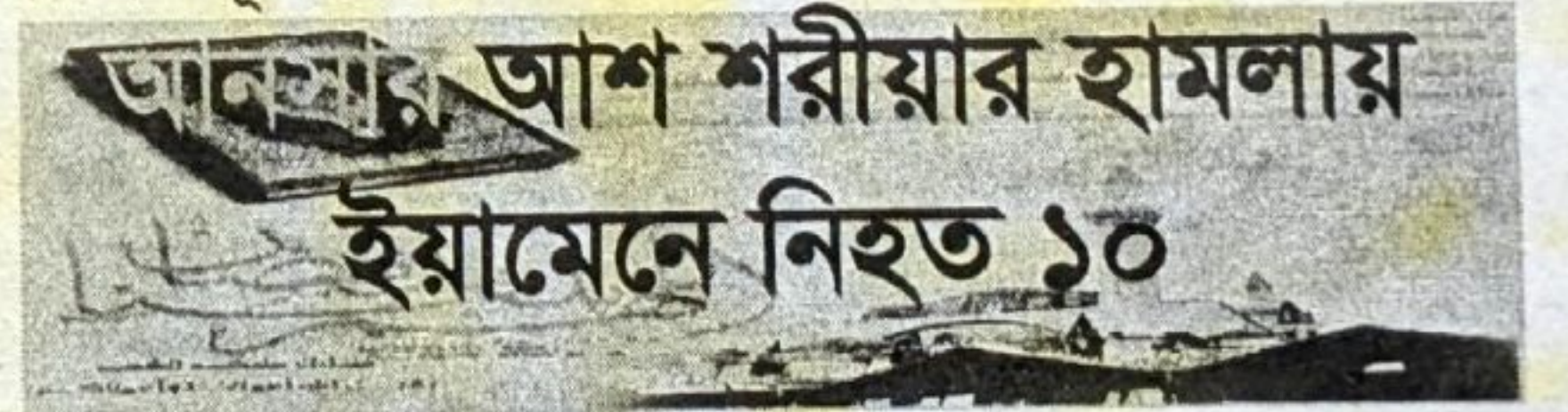
ভাজন হত্যাকারী দুই ভাইকে ধরতে তিনদিনের ব্যাপক অভিযান শেষে শুক্রবার তারা পুলিশের গুলিতে শাহাদত বরণ করেন। তাদের নিহতের পর বিএম এফ টেলিভিশন তাদের দেয়া বার্তাটি সম্প্রচার করে। আলকায়দার আন্তর্জাতিক সদস্য সংগ্রহের জন্য এই দুই ভাই বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত প্রভাব শালী নেতা ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই কোয়াশী ভাইয়েরা ২০১১ সালে ইয়েমেনে অবস্থান কালে আল আওলাকির সাথে দেখা করেছিলেন। তারা উভয়ে ছিলেন প্যারিসের একটি ইসলাম পন্থী গোষ্ঠীর সদস্য। তাদের মধ্যে বড় জন সাঈদ কোয়াশী (৩৪) এখনও পুলিশ হেফাজতে আছেন।

জাতি সংঘের ত্রাণের বাঞ্ছা আইএস এর কালো পতাকার লোগো

স্টাফ রিপোর্টারঃ ৩-২-২০১৫ তারিখ সোমবার। জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য প্রকল্পের (ডব্লিউএফপি) ত্রাণের প্যাকেটে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) লোগো লাগিয়ে সেগুলো সিরিয়ায় বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এ সংক্রান্ত খবর ও ছবি দেখে ডব্লিউ এফপি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ছবিগুলো আইএস আইএস সংশ্লিষ্ট একটি ওয়েব সাইট থেকে ছড়িয়ে পড়ে। ছবিতে দেখা যায়, কার্ডবোর্ডের যে বাক্স থেকে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে ওই বাক্সের সাথে ডব্লিউএফপি'র লোগোর ওপর 'ইসলামিক স্টেট ইন সিরিয়া (আইএস আইএস) লেখা লেবেল লাগানো। একবিবৃতিতে ডব্লিউ এফপির জরুরি আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মুহাম্মদ হাদি বলেন, সিরিয়ার মত জায়গা যেখানে খাদ্য সহায়তার ভীষণ প্রয়োজন সেখানে ডব্লিউএফপির ত্রাণে এভাবে হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ছবিগুলো সত্যি কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে ডব্লিউএফপি। ছবি গুলো দেখে ধারণা করা হচ্ছে যে, এগুলো আলেপ্পো থেকে প্রায় ৫০ কি,মি দূরে দেউর হাফর গ্রাম থেকে তোলা হয়েছে। সেপ্টেম্বরে এমএআরসির গুদামে হামলা চালিয়ে আইএস মোজাহিদেরা সেগুলো নিয়ে গিয়েছিল।



স্টাফ রিপোর্টারঃ ৩১-১-২০১৫ শনিবারঃ ইরাকের উত্তরাঞ্চলে একটি ছোট তেলখনির দখল নিয়েছে ইসলামিক স্টেট (আইএস) মোজাহিদেরা। ঐ তেলখনির ১৫জন কর্মীও নিখোজ রয়েছে। কিরকুক শহরের খাবাজ এলাকায় তেলের ওই খনিটি অবস্থিত। সেখানে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালিত নর্থ অয়েল কোম্পানির দুই জন কর্মকর্তা তাদের অশোধিত তেলের ওই খনিটি বেদখল হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন। ওখানে থাকা ১৫জন কর্মীর সাথেও কোনরূপ যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে তারা জানান। আইএস এর ভয়ে নাম প্রকাশ করতে না চাওয়া নর্থ অয়েল কোম্পানির একজন প্রভাবশালী রয়টার্সকে জানান, ওই তেল খনির একজন কর্মী আমাদের কাছে ফোন করে বলেন, কয়েক জন আইএস যোদ্ধারা তাদের ঘিরে ফেলেছে এবং তাদেরকে খনি থেকে চলে যেতে বলেছে। ঠিক এই ফোনের পর আর তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব তাদের কে জিম্মি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আইএস মোজাহিদেরা এ পর্যন্ত ৪টি তেলখনি দখলে নিয়েছে। সেগুলো সব অশোধিত তেলের খনি এবং ইতিমধ্যেই তারা পেট্রোল বিক্রি শুরু করেছে।



স্টাফ রিপোর্টারঃ ২-২-২০১৫ঃ ইয়েমেনের শিয়া হুতি বিদ্রোহী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আল কায়দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোজাহিদীন আনসার আশ শরীয়ার চালানো চারদিনের বিভিন্ন হামলায় অন্তত পক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছে। রোববার ইয়েমেনের স্থানীয় কর্মকর্তারা ও মোজাহিদীনগণ এসব তথ্য জানিয়েছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করার পর থেকে ইয়েমেনের পরিস্থিতি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে। এর আগে দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য হুতি বিদ্রোহীরা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ঘেরাও করে রাষ্ট্র প্রধানকে অন্তরীণ করে রেখেছিল। হুতি উত্থানে মোজাহিদীনরা ও সুন্নি উপজাতিরাও উত্তেজিত হয় উঠে। রোববার নিজেদের টুইটারে একাউন্টে আনসার আশ শরীয়া জানিয়েছে, তাদের সদস্যরা ইয়েমেনের মধ্যাঞ্চলীয় শহর ইব এ হুতি কমান্ডার আবু আবদুল্লাহ আল আয়দিকে হত্যা করেছে। শহরটির সরকারী কর্মকর্তারা আয়দি নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ লাহজে শুক্রবার একজন সেনাকর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে মোজাহিদীনরা।

মিশরে ব্রাদারহুডের ১৮৩ সমর্থকের মৃত্যুদণ্ড



স্টাফ রিপোর্টারঃ ২-২-২০১৫ সোমবারঃ মিশরে তাগুত কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামপন্থী মুসলিম দল ব্রাদারহুডের ১৮৩ সমর্থককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে হত্যার অভিযোগে তাদেরকে এ দণ্ড দেয়া হয়। ২০১৩ সালের আগস্টে কারদাসা শহরে ১৬ পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার ঘটনায় ভূমিকা থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন তারা। ওই বছরের বিক্ষোভ সহিংসতার মধ্যেই মিশরের সেনাবাহিনী ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সুরসিকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ৩৪ জনকে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হয়। মুরসির পতনের পর থেকে তার দল মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর চলতে থাকা বড় ধরনের দমনাভিযান আরো জোরদার করেছে তাগুত সরকার। এ পর্যন্ত গণহারে ব্রাদারহুডের হাজার হাজার সমর্থককে গ্রেফতার করে তাদের প্রহসন মূলক বিচার করেছে আদালত। দেশের মানবাধিকার গ্রুপগুলো বলছে, সরকার ধারাবাহিক ভাবে বিরোধী দলগুলোর উপর দমনপীড়ন চালাচ্ছে। মুরসিকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসা সেনাপ্রধান প্রেসিডেন্ট আদেল ফাততাহ আস সিসি ব্রাদারহুডকে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার হুমকি বলে মনে করেছে।

আফগানিস্তানে তিন মার্কিন ঠিকাদার নিহত

স্টাফ রিপোর্টারঃ ১-২-২০১৫, রবিবারঃ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সামরিক বিমানবন্দরে এক আফগান সেনার গুলিতে তিন মার্কিন ঠিকাদার নিহত হয়েছেন। এখবর জানিয়েছে আফগান বিমানবাহিনীর এক কর্মকর্তা।



স্টাফ রিপোর্টারঃ ১-২-২০১৫ সোমবারঃ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সামরিক বিমান বন্দরে এক আফগান সেনার গুলিতে তিন মার্কিন ঠিকাদার নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার এ ঘটনায় অপর এক মার্কিন ঠিকাদার আহত হয়েছেন, জানিয়েছে আফগান বিমানবাহিনীর এক কর্মকর্তা। তালেবান এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে জানিয়েছে সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী এক তালেবান সদস্য হামলাটি চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার ৫-২-২০১৫ তারিখে সন্ধ্যায় এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে আফগানিস্তানে মোতায়েন আন্তর্জাতিক কুফফার বাহিনীর এক সিনিয়র কর্মকর্তা। এ সময় এক আফগান নাগরিকও নিহত হয়েছেন বলে তারা এক বিবৃতিতে উল্লেখ করলেও নিহত ব্যক্তি হামলাকারী কিনা তা নিশ্চিত হতে পারে নি আন্তর্জাতিক বাহিনী। তবে সেনা সদস্য কর্তৃক মার্কিন সৈন্য হত্যা আফগানিস্তানে নতুন কোন ঘটনা নয়। এটি চলমান একটি কুফফার হত্যার মহড়া যা সে দেশে চলমান একটি প্রক্রিয়া।

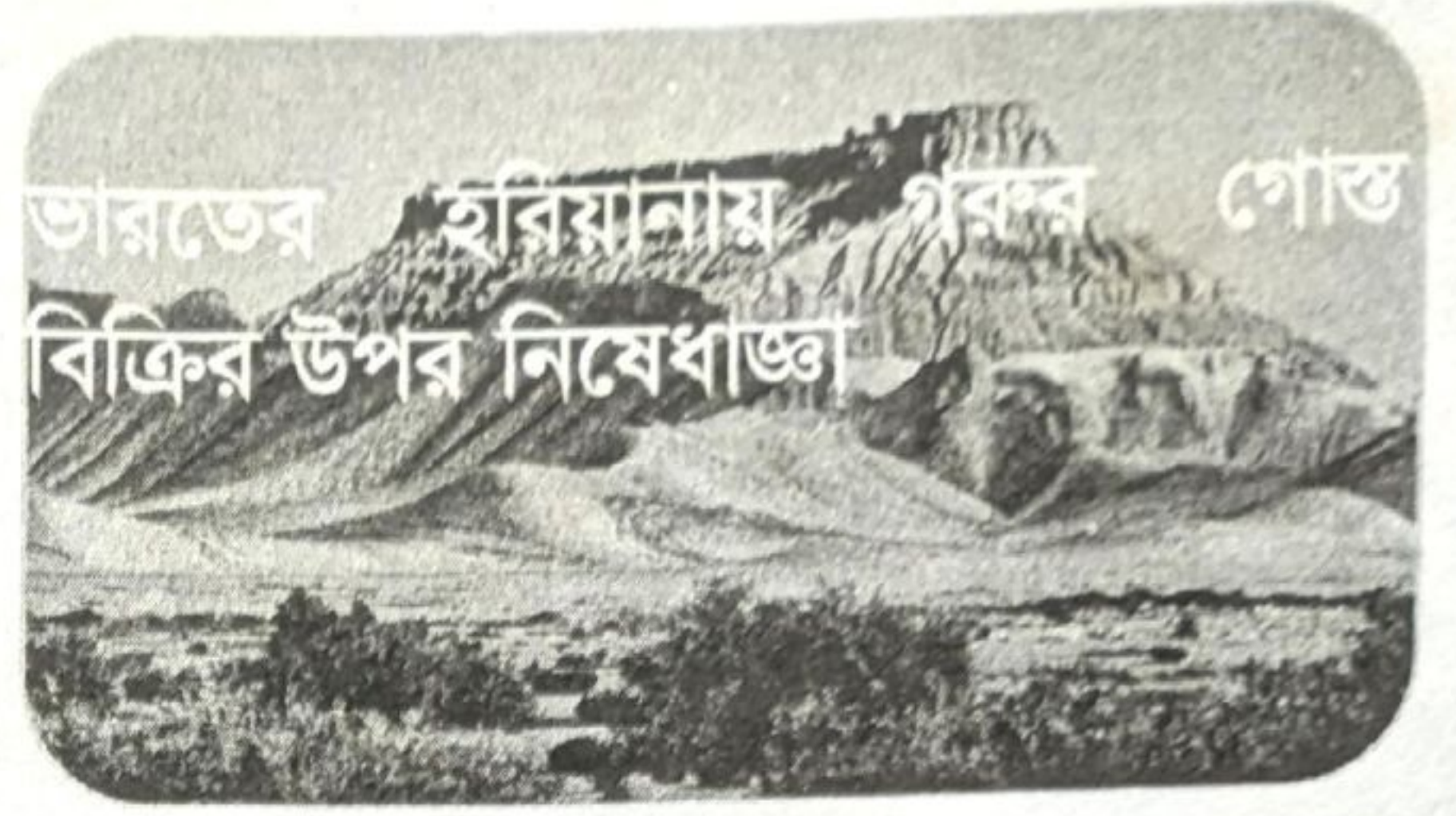
ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ভানুয়াতুতে বহু মানুষের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টারঃ ১৪-৩-২০১৫ শনিবারঃ পাঁচমাত্রার ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'পাম' এর আঘাতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতুতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে জাতিসংঘ ত্রাণ সংস্থাগুলো। শুক্রবার রাতে ঘণ্টায় ২৭০ কিঃমিঃ (১৭০ মাইল/ঘণ্টা) বেগে বয়ে যাওয়া বাতাসের তান্ডবে ভানুয়াতুতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আপলোড করা ছবিগুলোতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও উপড়ে পড়ে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি দেখা গেছে। ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পর দেশটির বিশাল এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ত্রাণ সংস্থাগুলো শনিবার জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিহ্ন পাওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে কয়েক হাজার মানুষ রাত্রি যাপন করলেও অধিকাংশ মানুষই প্রচণ্ড ঝড়ের সময় নিজবাড়িতে থাকতে বাধ্য হন। ভানুয়াতুতে আঘাত হানার আগে পাম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অপর দ্বীপপুঞ্জ কিরবাতি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জেও ব্যাপক আঘাত হানে। পামের প্রভাবে ভানুয়াতুতে উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত নয়টি ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র টুডালতে হঠাৎ বন্যা দেখা দিলে সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ভানুয়াতুতের পর 'পাম' পরবর্তী দ্বীপদেশ ফিজিতে আঘাত হানবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফিজি থেকে জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মকর্তা সূনে গুদনিংজ জানিয়েছে, অনেক মৃত্যুর পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ব্যাপক বৃষ্টিপাত হঠাৎ বন্যা ভূমিধ্বস ও ঝড়ের আশংকা করছেন তারা। দেশটির ছয়টি প্রদেশের ছয়টি প্রদেশের সবগুলোতেই রেড এলাট জারি করে সব বাসিন্দাদের আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ত্রিপোলিতে হামলার দায় স্বীকার করল আইএস মোজাহিদ্দীন

স্টাফ রিপোর্টারঃ ১৬-৩-২০১৫ সোমবারঃ ইসলামিক স্টেট (আইএস) এর প্রতি অনুগত লিবিয়ার মোজাহিদ্দীনরা দেশটির রাজধানী ত্রিপোলীতে একটি পুলিশি তল্লাশি চৌকিতে বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। সামাজিক যোগাযোগ ওয়েব সাইট এ আইএস মোজাহিদ্দীনরা একটি ছবি প্রকাশ করে তা বিস্ফোড়ন স্থানে বলে দাবি করে। রোববার ত্রিপোলির শহরতলীতে নিরাপত্তাবাহিনীর দপ্তরের পাশে চালানো ওই হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে নিরাপত্তাবাহিনীর মুখপাত্র এসাম নাস জানিয়েছে। ওদিকে লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মিসতাতায় একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোড়ন হয়েছে। একটি বেসামরিক বাহিনীর শিবিরের সামনে ঘটানো এ বিস্ফোড়নে অন্ততপক্ষে একজন নিহত হয়েছে।

তাৎক্ষনিক ভাবে এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। তবে যে বাহিনীর শিবিরের সামনে বোমাটির বিস্ফোড়ন ঘটানো হয়েছে তারা আইএস এর বিরুদ্ধে লড়াইরত। ১৬৬বিগ্রেড নামে পরিচিত ওই বেসামরিক বাহিনীর সঙ্গে সিত্তেয় পূর্বদিকের এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। সিরিয়া ও ইরাকের বিশাল অংশ দখল করে ইসলামিক খেলাফত ঘোষণা করা আইএস, লিবিয়ার অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে দেশটিতে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। লিবিয়ার সাবেক একনায়কতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মদ গাদ্দাফির পতনের চার বছর পর দেশটির বৈধতার দাবিদার দুই সরকারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দুই সরকারের অনুগত বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছে।



স্টাফ রিপোর্টারঃ ১৪-৩-২০১৫ শনিবারঃ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে যে কোন ধরনের গরুর গোস্ত বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হচ্ছে। এছাড়া গোহত্যাকারীর প্রতি শাস্তির বিধান রেখে নতুন একটি আইন প্রস্তাব করা হয়েছে। শনিবার রাজ্যেও কৃষি এবং পশুপালন মন্ত্রী ও.পি. ধনকার বলে 'টিনের কৌটায় প্রক্রিয়াজাত গরুর গোস্তও এই নিষেধাজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত কংগ্রেস সরকারের আমলে যা বৈধ ছিল। বিজেপি নেতা মনোহর লাল খাত্তার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার বিধান সভা বিজেপি নিয়ন্ত্রিত। ফলে গরুর গোস্ত সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব শিগগিরই আইনে পরিণত হচ্ছে। নতুন আইনে গোহত্যাকারী ১০ বছরের কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া যে যানবাহনে গরুর গোস্ত বহন করা হবে তার চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ওই যানবাহন ফ্রোক করা হবে, বলে ধনকার প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। তবে গোহত্যাকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২(হত্যা) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হবে না বলেও ধনকার উল্লেখ করে। এই সব আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গরু রক্ষা ও পালনে উৎসাহ দেয়া। উল্লেখ্য যে ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যেও গরুর গোস্ত বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।



সাদামের স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করল আইএস মোজাহিদ্দীনরা

স্টাফ রিপোর্টারঃ ১৬-৩-২০১৫ সোমবারঃ ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেনের করবকে ঘিরে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ধ্বংস হয়ে গেছে। তিরকিতে প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময় আল-আওজা গ্রামে থাকা এই সৌধটি ধ্বংস করে ফেলা হয় বলে বিবিসি জানিয়েছে। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন, কবর থেকে সাদামের দেহাবশেষ আগেই অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গ্রামটির সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্তরা জানিয়েছেন, ২০১৪ সালেই সাদামের দেহাবশেষ করব হতে অন্যস্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিওফুটেজে দেখা যায় সাদামের করবের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেবল কয়েকটি পিলার এখনও দরিয়মান। শিয়া আধা সামরিক বাহিনীর একজন কর্মকর্তা বলেন, এলাকা বেশিরভাগ অংশ আইএস মোজাহিদ্দরা ধ্বংস করেছে। কারণ এখানে সাদাম হোসেনের করব রয়েছে। ইরাকের সাবেক একনায়ক সাদাম হোসেন ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইরাকের একটি আদালত তাকে মৃত্যু দণ্ড দেয়। তার বিরুদ্ধে শিয়া ও কুর্দিদের হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ২০০৬ সালে সাদামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এরপর ২০০৭ সাল থেকে তিরকিতে এই স্মৃতিসৌধই সাদামের দেহাবশেষ কবরস্থ করে রাখা হয়েছিল। ২০১৪ সালের জুন থেকে তিরকিত আইএস এর দখলে ছিল।



আবিষ্কারের কাহিনীতে আজ আমরা সাবমেরিন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। কেননা, আমরা সাবমেরিন নামটি হয়তো অনেক শুনেছি পেপার পত্রিকায় বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার খবরে। কিন্তু সেটা কি/ কাজ কি/ কিভাবে কাজ করে তা কোনদিন জানা হয়নি। আসুন এবার মূল আলোচনায় ফেরা যাক।

সাব মেরিন এক অর্থে জাহাজ হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা হলো ডুবোজাহাজ। কারণ, পানির ওপর দিয়ে তো বটেই, পানির নিচ দিয়েও এটা চলাচল করতে পারে।

দেখতে অনেকটা সাধারণ জলযানের মতো হলেও এর বাইরের খোল একটি নয়-দুইটি। এই দুইটি খোলের মধ্যবর্তী স্থান থাকে ফাঁকা। বাইরের আবরণের থেকে ভেতরের আবরণ বেশ শক্ত আর মজবুত। দুই আবরণের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটুকু পানি বা বাতাস দিয়ে ভর্তি করে রাখা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাবমেরিনকে ব্যবহার করা হয়েছিল ডুবোজাহাজ হিসেবে। এই সময় শত্রুপক্ষের জাহাজে টর্পেডো ছোঁড়ার কাজে সাবমেরিনকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া, শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে তাদের জাহাজগুলোর ক্ষতিসাধন করার কাজেও লিপ্ত ছিল সাবমেরিন। পানির নিজ দিয়ে চলাচল করত বলে, শত্রুপক্ষ সাবমেরিনের অস্তিত্ব টের পেত না। পরবর্তীতে রাডারের আবিষ্কার হওয়াতে অনায়াসে পানির গভীর থেকে সাবমেরিনের অস্তিত্ব খুঁজে বের করে সেটাকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল।

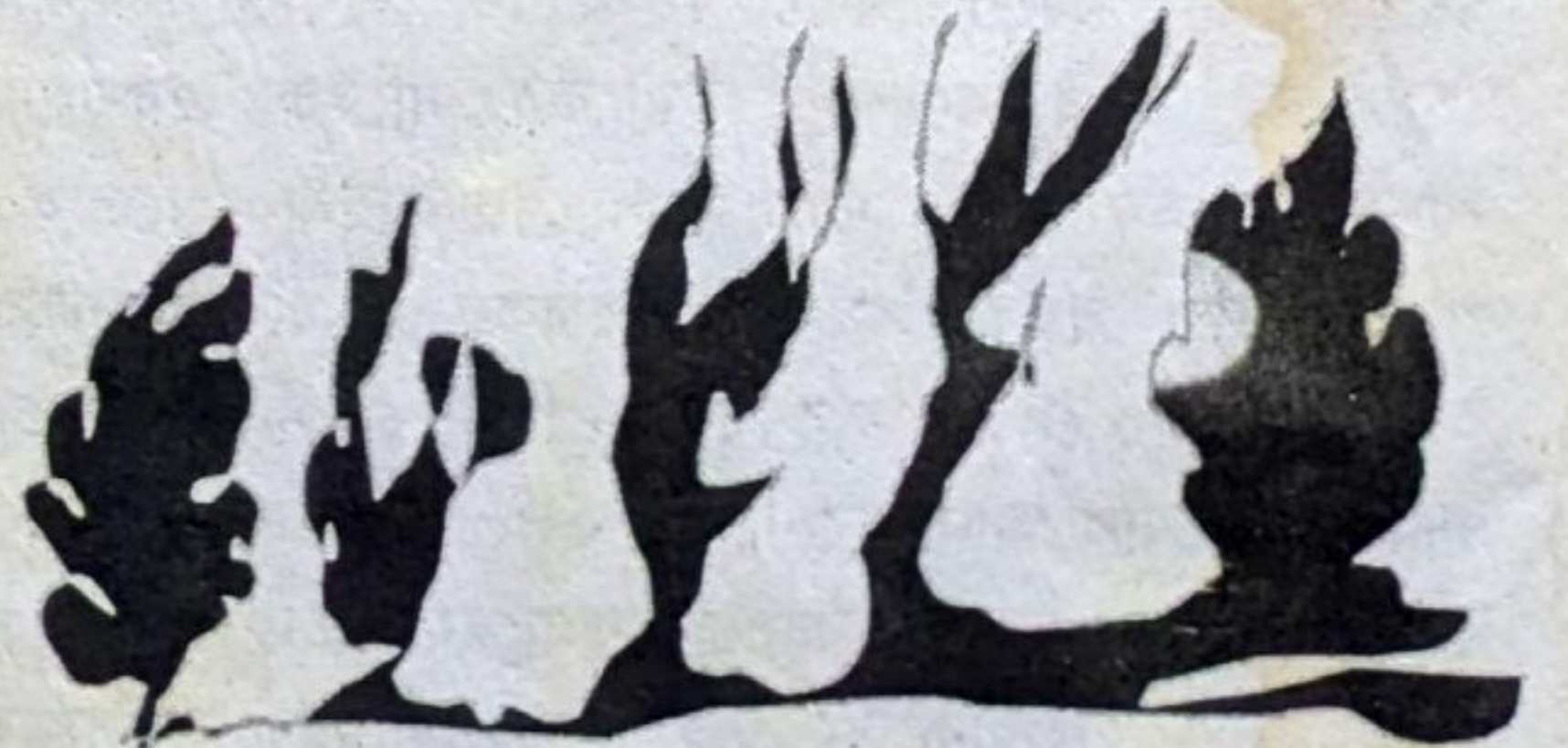
পানির ভেতর ওঠানামা করার জন্যে সাবমেরিনে বেশ কয়েক ধরনের পানির ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। পানির নিচে ডুব দেবার প্রয়োজন হলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই ট্যাঙ্ক গুলোকে পানিতে ভর্তি করা হয়। এই পানির ওজনে সাবমেরিন একাএকাই পানির গভীরে ডুবে যায়। আবার পানির উপর থাকার সময় উক্ত ট্যাঙ্কগুলো থেকে ফেলে দেয়া হয়।

১৮০০ সালের শেষদিকেই মানুষ সাবমেরিন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। রবার্ট ফুলটন নামের একজন জাহাজ প্রস্তুত কারক প্রথম তৈরী করেন ডুবোজাহাজ। তাঁর নামেই জাহাজটির নাম করণ করা হয় ফুলটন নামে। তবে জাহাজটিকে সত্যিকার অর্থে সাবমেরিন বলা যায় না। কারণ জাহাজটি সমুদ্রের তলদেশে বসবাস করতে পারতো বটে, তবে গতিবেগ নিয়ে ছুটে চলতে পারতো না। তবে ফুলটনের এই চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়েই পরবর্তীতে উন্নতমানের সাবমেরিন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

একটি উন্নত মানের সাবমেরিন চালানোর জন্য দুই ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। পানির উপর দিয়ে চলার সময় ব্যবহার করা হয় ডিজেল ইঞ্জিন। পানির তলা দিয়ে যাবার সময় ডিজেল ইঞ্জিন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এই সময় ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। এই ইলেকট্রিক ইঞ্জিনে বিদ্যুৎ শক্তির যোগান দেয় বড়ো আকারের ডায়নামো বা বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র। পানির তলায় অবস্থান কালে সমুদ্রের উপরের দৃশ্য অবলোকক করার জন্য ব্যবহার করা হয় পেরিস্কোপ নামের একটি বস্তু। আর বাতাস সংগ্রহের জন্য দরকার হয় সুরফেল নামের একটি ফাঁফা নল বিশিষ্ট যন্ত্র।

১৯৫৫সালের আগ পর্যন্ত সাবমেরিন এই শক্তিতেই চলতো। তবে উক্ত সাল থেকেই সাবমেরিনকে চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় পরমাণু শক্তি। এই শক্তি ব্যবহার করে প্রথম ডুবোজাহাজ তৈরী করে আমেরিকা। পরে তার দেখাদেখি রাশিয়াও তৈরী করে সর্বাধুনিক পারমাণবিক ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন।

এই সাবমেরিনগুলো দীর্ঘদিন পানির অনেক গভীরে অবস্থান করতে পারে। বিশেষ করে তীব্র বরফাচ্ছন্ন এলাকাগুলোতে বরফের নিচের পানিতে অবস্থান করতে পারে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন। সেখান থেকে স্থলভাগের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার মতো আধুনিক ব্যবস্থাও রয়েছে এই ডুবোজাহাজে।





नाद